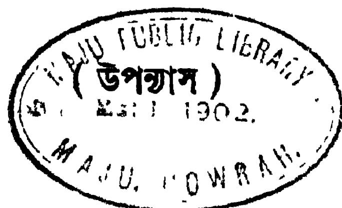
আট আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার—৩য় গ্রন্থ

মণি-হারা



(উপন্যাস)

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ

প্রণীত।

মুখার্জি বোস এণ্ড কোং,

কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

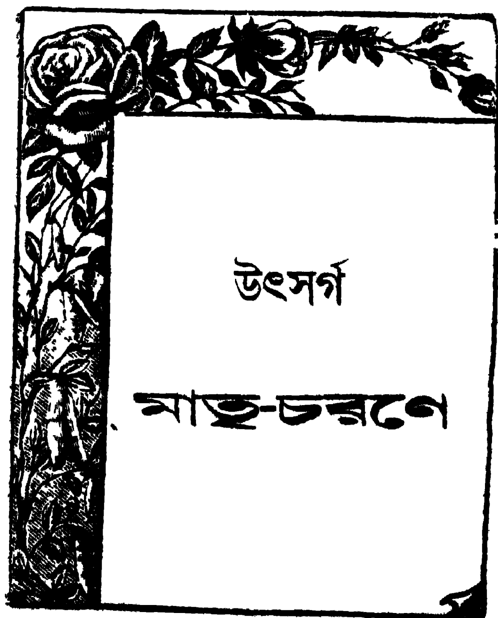
১৩২৪

মূল্য ॥৹ আনা।

প্রকাশক
শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
মুখার্জ্জি বোস এণ্ড কোং,
কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস,
১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



প্রিণ্টার
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৪এ রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা


উৎসর্গ
মাতৃ-চরণে

মণি-হারা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গুণে যাহা ছিল না—নামে সেইটুকু ভরাইয়া তুলিবার জন্যই বাপ মা এই মেয়েটির নাম দিয়াছিল অনিন্দ্যা! পাড়া গাঁয়ে এ নাম একান্ত দুর্লভ ছিল। অথচ কোথা হইতে তাহার বাপ মা এই দুর্লভ নামটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন প্রতিবাসীদের তাঁহা জানিবার আদৌ আবশ্যক বিবেচনা হয় নাই। যে হেতু চাক্ষুষ পরিচয়ই, এই নিখুঁৎ মেয়েটিকে জানিবার পক্ষে যথেষ্ট অবকাশ দিয়াছিল। তাহার নাক মুখ চোক, চলন বলন ভঙ্গী, কোন্ খানটা রাখিয়া কোন খানটার উপমা দিবার উপায় ছিল না। অনিন্দ্যা ছিল নিন্দার বাহিরে—

একদিন সহর হইতে তাহার পিসী আসিয়া ভ্রাতা গোষ্ঠবিহারীকে ডাকিয়া কহিল। দাদা এ মেয়ের—যে, তুমি কোথায় বিয়ের ঠিক করচো তা ত ভেবে পাইনে ভদ্রলোকের ঘরে পড়বে কি ?

গোষ্ঠ হাসিয়া কহিল অদৃষ্ট যেখানে লিখেছে—

জনৈক প্রতিবাসী কহিল তবু ঐ মেয়েকে, বুকহতে নামানোই নাই।

অনিন্দ্যা কোথায় ছিল; লাফাইতে লাফাইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল। বাবা তুমি যে ব'লেছ বনের হরিতকীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে।—

বেহায়া মেয়ের রকম দেখিয়া অনিন্দ্যার পিসী একবারে থ হইয়া গেলেন। অনিন্দ্যা কিন্তু একটু গ্রাহ্যও না করিয়া তাহার পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল চলো বাবা কলকে ফুলের একটা ডাল পেড়ে দেবে, আমার পুতুলের বিয়ে ডাল ভাত চচ্চরি রাঁধতে হবে। অনিন্দ্যার মা তাহার ঠাকুরঝীকে দেখাইয়া কহিলেন দেখ ঠাকুরঝী মেয়েটীকে যে বকে ঝকে একটু সভ্য ভব্য করবো। তারও মাথাটি উনি খাচ্চেন।

অনিন্দ্যার পিতা বলিত মেয়ে আমার একটু দুষ্টু হইয়া জন্মিয়াছে তাই বলিয়া ত তাহাকে এখন হইতে কড়া শাসনে কোনের বউটি করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি না।

এগারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যখন এইরূপ পিতার অযথা প্রশ্রয়ে একশত খানা প্রথম ভাগ ছিঁড়িয়া ও "পার-লৌকিকের" পাত পর্য্যন্ত পৌঁছিল না উপরন্তু আত্মীয়

স্বজনদের যথেষ্ট 'পরিবেদনার' কারণ হইয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার মা মেয়ের মাথা বাঁধা হইতে পা কামাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত সকল ভার তাহার অযোগ্য পিতার স্কন্ধে তুলিয়া দিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন।

মেয়ের ভাবনাতেই যে তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন তাহা নহে সংসারে আসিয়া যতটুকু খাটুনি খাটা তাঁহার উচিত ছিল, তাহার অতিরিক্তই খাটিতে হইয়াছিল তাহার উপর আরও কয়েকটি ছেলে মেয়ের ভারে দেহ একবারেই ভাঙিয়া পড়িল।—এবং আস্তে আস্তে সংসারের হাজার জ্বালা যন্ত্রণা এড়াইয়া এই বাংলা দেশেরই মেয়েদের মত নিঃশব্দে ঘুমাইয়া পড়িলেন। মৃত্যুর পরও দৃষ্টিতে তাঁহার যেন, কি একটা প্রসন্ন মঙ্গল আশীর্ব্বাদ জড়াইয়া ছিল।

সংসারের মধ্যে হঠাৎ এই মৃত্যুর আনাগোনায় আর যেই যতটা আঘাত পাউক অনিন্দ্যার দিকে আঘাতটা মোটেই পৌঁছিল না! দিন কতক খুব কাঁদিল তা[redacted] দেখিল তাহার চুল বাঁধা হইল না বলিয়া কাহারও ধরা পাকড় নাই,—কাঁটা ফিতা রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া আসিলেও কেহ তিরস্কার করিতে নাই,—উপরন্তু কেহ একটা কথা বলিলে পিতা তাহারই পক্ষ হইয়া লড়িতেছে তখন সে

বাঁচিল। একবারে হাঁপ ছাড়িয়াই বাঁচিল। এবং তাহার পিঠের উপরে এলো চুলের গোছা উলু বনের মত বায়ু হিল্লোলে দুলিয়া বেড়াইতে লাগিল!

বৎসরাবধি বিবাহের কথাও কেহ তুলিল না! অনিন্দ্যার আনন্দের সীমা নাই। তাহার দলের যতগুলি সই সাঙাতি ছিল জনে জনে বলিয়া আসিল বনের হরিতকীর সহিতই তাহার বিবাহ পাকা হইয়া গিয়াছে, এবং সে চিরকাল বাপের বাড়িতেই থাকিতে পাইবে।

পড়শীরা ভৎর্সনা করিয়া কহিল ওরে রাক্ষুসী ভয় নাই তোকে বিবাহ করিতে কোনো রাজার ছেলেই ডিঙা বাহিয়া সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া এখান পর্য্যন্ত পৌঁছিবে না। তুই এই গ্রামের রাখাল বালক লইয়াই থাকিবি।

অথচ এই অনিষ্ট ছেলের দলে দাঁড়াইয়া যখন কোন দূরান্তগামী পথিক তাহাদের গ্রামের রাস্তাদিয়া চলিয়া যাইত; তখন পথিক দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইলে ভাঙা অশ্বথ গাছের গুঁড়িটায় দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া ছড়া কাটিত।

"কোন্ বা দেশের রাজার ছেলে—
কোন বা দেশে ঘর—

আমার সঙ্গে চলো তুমি
হবে আমার বর !

অনর্গলই বকিয়া যাইত।

কেহই এই প্রহেলিকাময়ী মেয়েটির দুষ্টামী কোন পথে যাইবে তাহার ঠিক করিতে পারিত না। তবে তাহার ছোট খুড়তুত ভাইটি আসিয়া যখন খুব খানিক কিল চড় কসিয়া দিত—তখন তাহাকে অনেকটা সিধা রাস্তায় পাওয়া যাইত। নচেৎ নহে। অনিন্দ্যার দাদা রাসবিহারী বলিত। ও রাক্ষুসী চিরআইবুড় হয়েই গ্রামে থাকবে।

গোষ্ঠ বলিত তাই থাকুক। তাই বলিয়া উহাকে কেহ মারিতে ধরিতে বা বকিতে পাইবে না। গোষ্ঠর একটা সাহস ছিল সে যখন চাকরী করিয়াছে তখন যে গোপনে হাজার খানেক টাকা পুঁজি করিয়া রাখিয়াছে সেই টাকাতে নিশ্চয় ভাল পাত্র একটা জুটাইতে পারিবে। সে অল্প বয়স হইতে পটোয়ারীর কর্ম্ম করিয়া বুঝিয়াছে টাকায় যখন সাদা কালো হয় তখন কালো মেয়ের পাত্র জুটিবে না কেমন কথা। মেয়ের সকল আবদার সকল উপদ্রব আপনার সুগভীর স্নেহ দিয়া ঢাকিয়া লইত।

একে একে তাহার সকল সঙ্গিনীদেরই বিবাহ হইয়া যাইতে লাগিল। অনিন্দ্যাও বিবাহ বাড়ীর তৈল হরিদ্রা

খুব আভাঙ করিয়া মাথিয়া নদীর জলে ডুব দিয়া আসিতে লাগিল। যে কেহ সে সময় তাহার বিবাহ কথা পাড়িতে লাগিল তাহার গায়ে জল ছেঁচিয়া গাল মন্দ করিয়া কহিতে লাগিল—আমি জন্মেই বিয়ে করবো না তোদের কি—আসল কথা তাহার বাপকে ছাড়িয়া কোথাও এক-দিন থাকিতে হইবে ভাবিলে শিহরিয়া উঠিত ; বাপ্‌ও এই মেয়েটিকে ফেলিয়া অন্যত্র একদিন কাটাইতে পারিতেন না—যদিই কোন দিন কাজের গতিকে জেলার সদরে বা আর কোথাও রাত্রিটা কাটাইতে হইত তবে কেবলি ভাবিতেন আহা মেয়ে আমার হয়ত এতক্ষণ বাবা বাবা করিয়া সারা হইয়া যাইতেছে, সর্ব্বোপেক্ষা বাড়ীর ছেলেরা যে অসহায়ে তাহার উপর অনেক কিল চড় বর্ষণ করিয়া যাইতেছে এইটেই বড় করিয়া তাঁহার ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইত।

এমন করিয়াও পিতার স্নেহ পক্ষপুট ছায়ার—অসীম নির্ভরতার মাঝখানে, অনিন্দ্যার বেশী দিন কাটিল না—তাহাকে একদিন কাপড় চোপড় পড়াইয়া খুব খানিকটা নারিকেল তৈলে মাথার রুক্ষ কেশগুলি জব্‌জবে করিয়া বাঁধিয়া দিয়া এক কন্যা দর্শনার্থী বৃদ্ধের সম্মুখে আনিয়া হাজির করা হইল!

আসিতে কি চাহে। পিতার মিনতিতে ও প্রলোভনে

আসিতে রাজী হইল যদি, কিন্তু কন্যাদর্শনার্থীর একটা কথার উত্তর দিল না কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই আগন্তুক বৃদ্ধকে কোনরূপ গাল মন্দ দিবার উপায় ছিল না যেহেতু পিছনে যমের মত তাহার খুবতুত ভাই গন্‌শা বসিয়া ছিল—এবং গোলমাল করিলে সে মারিবে বলিয়া শাসাই-য়াছেও তাই, নহিলে আজ সে যাই হউক একটা খণ্ড প্রলয় বাধাইয়া দিত। কিন্তু তাহার পিতার উপর আজ বড় রাগ হইল। সন্ধ্যার সময় গায়ের সমস্ত কাপড় জামা খুলিয়া ফেলিয়া বাপের কাছে আসিয়া অভিমান রুদ্ধস্বরে কহিল। বাবা তোমার ঘরে কি ভাত একবারে ফুরিয়েছে তাই আমাকে বিদেয়—করবার এত চেষ্টা—তা আমি যাবো একবারেই যাবো—বলিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার পিতার চক্ষেও জল দেখা দিল। সযত্নে স্নেহভরে কন্যার অশ্রুটুকু মুছাইয়া দিয়া কোলে বসাইয়া কহিল। না মা তোর বিয়ে—আমি এমন জায়গায় দেব তোকে যে দিন মন, নিয়ে আসতে পারবো, আর তুইও পার্ব্বি। অদৃষ্ট বিধাতা মনে মনে হাসিলেন।

পরদিন যখন কন্যাদর্শনার্থী কন্যা অপছন্দ করিয়া চলিয়া গেল তখন গোষ্ঠর ভগ্নী, রাণী আসিয়া কহিল কেমন দাদা।

হলো কিনা এখন তোমার ব্রহ্মময়ীকে নিয়ে কোথায়,ভাসবে ভাসো। তখন যে ব'লতে আমার কালো রূপে জগত আলো করা মেয়ে,—দশের বাক্যি ফলছে কিনা—

গোষ্ঠবিহারী একথার কি জবাব দিবে ভাবিয়া পাইল না —সকলে ত তাহারই উপরে দোষ চাপাইতেছে সত্যই কি তাহার এই দুষ্ট মেয়েটির জন্য সেই দায়ী ? তাহার—জন্ম নক্ষত্রই যে তাহাকে উশৃঙ্খল করিয়া দিয়াছে, তুমি আমি মানুষে তাহার কি করিব—গোষ্ঠ আশ্বাস দিয়া কহিল— দেখো আমি বলছি এখন ও যত মন্দ আছে কালে তত ভালই হবে।

এদিকে বিবাহের বয়স ক্রমেই যত বাড়িয়া যাইতে লাগিল সরল গোষ্ঠবিহারীর ললাট পট্টে চিন্তার রেখাগুলি তত কুঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল।—গোষ্ঠ তাহার বন্ধু সূর্য্যকান্তকে ডাকিয়া পাঠাইল।

অপেক্ষাকৃত কিছু প্রফুল্ল ভাবে সেদিন সূর্য্যকান্ত গোষ্ঠ-বিহারীর সহিত দেখা করিতে আসিল। আসিয়াই কহিল ওহে ভায়া কতকটা—কতকটা যেন নিমরাজী—

গোষ্ঠ চমকাইয়া কহিল বল কি !

সূর্য্য কহিল হাঁ—

গোষ্ঠ কহিল আমার যে কালো মেয়ে হে, তথাপি—

সূর্য্য কহিল। তথাপিও—

গোষ্ঠ সূর্য্যের হাতটা চাপিয়া কহিল বল দেখি ব্যাপারটা কি—

সূর্য্য কহিল আমি কিছু বেশী টাকাই কবলে ফেলে-ছিলাম, টাকায় কি না হয়—

গোষ্ঠ কহিল সে আমিও জানি তবু বলি কি, কি করে কথা তুলতে সাহস করলে—বুঝি তাদের গোমস্তা···

সূর্য্য কহিল হাঁ। আমি প্রথমেই হাজার টাকা দিয়ে কথা আরম্ভ করে ছিলাম। তারা উঠেছে দু'হাজার, আমি এগেয়েছি দেড় হাজার পর্য্যন্ত—বলে এসেছি কাল পাকা উত্তর দিয়ে যাবো।

গোষ্ঠ কহিল কিছু ভাবনা নাই ভাই আমাদের গতর খাটানো পয়সা তবু লোক্‌কে দেখাতে পারবো যে কি রকম জায়গায় কুটম্ব করেছি।

সূর্য্য কহিল নিশ্চয়ই হাজার হোক মরা হাতি লাক টাকা।

গোষ্ঠ বার বার আশ্চর্য্য হইয়া কহিতে লাগিল—যাই হোক ভাই তুমি বাহাদুর আছো।

সূর্য্য কহিল তবে শোনো—তাদের গোমস্তাটীকে নিয়ে প্রথম ত গেলাম কর্ত্তার কাছে, কর্ত্তা ত আমলই দিলেন না

তারপর অন্দরে···জানোই ত তাদের সেই দালানে বাড়ি কোথায় লাগে তার কাছে আমাদের এই মেটে ঘর—ওপরের দিকে চেয়ে দেখি আট্ দশটা জানলার খড়্ খড়ি ফর ফর করে খুলে গেল, বলবো কি ভায়া আমার যেন তখন সীতার অগ্নি পরীক্ষার মত পরীক্ষাই আরম্ভ হয়ে গেল। একখানা কার্পেটের আসন ত পেলাম বসতে, কিন্তু আমি ত আর তখন বসতে যাইনি—গিয়েছি কাজ উদ্ধার করতে একবারেই গিন্নীরাণীর পাদুটো না জড়িয়ে ধরে বল্লাম উদ্ধার করতে হবে!

গোষ্ঠ শ্রদ্ধায় দুই চক্ষু অশ্রু পূর্ণ করিয়া কহিল। আপনার সহোদর ভেয়ে যা না পারে তুমি যে তাই করেছ বন্ধু।

সূর্য্য কহিল। ও কিছু না দাদা তোমারও ঘাড়ে কন্যাদায় আমারও ঘাড়ে নয় কি—তারপর হাজার হোক বনেদি ঘরের মেয়ে ত, বল্লেন আমার ত বাপু মৌলিকে কখনও কাজ নাই—তবে যখন ধরছো তখন ১৫০০ হাজার টাকা পণ আর পাঁচশো বরাভরণ হলে পারি, যদিও এখন তারা দুহাজারের ঘর নয়—তবু মেয়েটা সদ্বংশে পড়বে ভেবে আমি আর কথা কাটা কাটি করলাম না—বল্লাম কাল এসে উত্তর দিয়ে যাবো!

গোষ্ঠ কহিল সেই মেজ ছেলেটি ত ?

সূর্য্যকান্ত কহিল হাঁ ছেলেত নয় যেন রাজপুত্তুর! গোষ্ঠর ইচ্ছা রাজপুত্রের হস্তেই কন্যা সম্প্রদান করিবে।

এখন ব্যাপারটা এই পুষ্প গ্রাম হইতে কিছুদূরে বারুই-পুরে একঘর নামজাদা বড়লোক ছিল। ভাগ্যলক্ষ্মী যদিও এই বড় মানুষদের অতি বড় বড়মানুষিতে কয়েকটা সরিকি মকর্দ্দমার স্কন্ধে চড়িয়া ইতিমধ্যেই অন্তর্ধান করিয়াছেন—তথাপি ঠাট বাট ও আদব কায়দা সেই সাবেকী ধরনেরই রহিয়া গিয়াছে, অতিথি অভাগত আসিলে এখনও সেইরূপই আশ্রয় পায় এবং ঠাকুর বাড়িতে এখনও নহবতের আলাপ সেই অতীত দিনের মতই কড়ি কোমলে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, কিন্তু এই অতীত গৌরবের গরিমাটুকু বহন করিতে এই কটি মুমুর্ষ প্রায় জমিদার পুত্রের বক্ষের অনেকগুলি পঞ্জর যে ভাঙ্গিরা গিয়াছে তাহা তাহাদের কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুর উজ্জ্বল দীপ্তিতেই প্রকাশ পায়। দেশের লোক এই জমিদার বাড়ি সম্বন্ধে বাহিরে যাহাই বলুক কিন্তু মুখে এখনও জয়গান গাহিতে বাধ্য।

ঘটনা সূত্রে এই জমিদার বাড়ির একটি পুত্রের সহিত অনিন্দ্যার বিবাহের প্রস্তাব উথাপিত হইয়া পড়িয়াছে এখন

"প্রজাপতির ভাবিতে" যাহা হয়। বারীনের বাপ হরকুমার দেখিলেন—যদি এক সঙ্গে দুই হাজার টাকা পাওয়া যায় মন্দ কি ? ছেলের বিদ্যাবুদ্ধি যাহা, তাহাতে তাঁহার পক্ষে দুই হাজার প্রাপ্তির আশা স্বপ্ন বলিলেই হয়। আপনার প্রথম পুত্রের বিবাহে কিছু পাইয়াছিলেন বটে কিন্তু তখন নাম ডাকটা এমন ধারা বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। অথচ এক-কালে দুই হাজার টাকায় একটা মহাজনকেও সন্তুষ্ট করিতে পারা যাইবে। পরদিন যখন সূর্য্যকান্ত দুই হাজার টাকাতেই মত দিয়া গেল তখন হরকুমার মোটেই আপত্তি করিলেন না। বরং সূর্য্যকান্তকে খুব ঘটা করিয়া খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিলেন। এবং তসরের চায়না কোটটার উপরে যে একটা বিলাতী খেলো চাদর জড়াইয়া গিয়াছিল সেটা শুভ বিবাহের চিহ্ন স্বরূপ—রং এ একবারে ডুবাইয়া দিলেন।

প্রতিবাসীরা কহিল এতদিনে বারীনের বিবাহের ফুল ফুটিল !

সূর্য্যকান্ত কহিল আমরাও প্রতিমা সাজাইতেছি !



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মেয়ে দেখানর হাঙ্গামটা যাহাতে না পোহাইতে হয়, বিহারী এইরূপ কোন মতলব সূর্য্যকান্তের মাথায় আছে কি না—জানিতে চাহিল।

সূর্য্যকান্ত কহিল এ তো আর বেশী কথা নয়। চেষ্টা করো যে টাকার অনাটন যাতে না ঘটে।

বিহারী কহিল আমার পুঁজির শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত আমার মেয়ের বিবাহ যজ্ঞে উজার করে ঢেলে দিব।

সূর্য্যকান্ত কহিল তবে নিশ্চিন্ত থাকো। আমি কর্ত্তাকে বলে এসেছি মেয়ের রং যদিও একটু ময়লা বটে কিন্তু সাক্ষাৎ একবারে পটের প্রতিমা—কর্ত্তার দেখায় অদেখায় কোন মতামত আছে বলে মনে হয় না।

কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় পাতাসী বাগ্দিনী আসিয়া কহিল ওগো তোমরা তোমাদের মেয়ে বেশ সাজাওগে-জামাই নিজে মেয়ে দেখতে আসবেন। আজ সন্ধ্যার সময় বা আসেন। আমি ওধার দিয়ে আমাদের কুটুম বাড়ি গিয়েছিলাম খোঁজ পেয়েছি।

গোষ্ঠ হতাশ হইয়া কহিল। তবে বোধ হয় আমার মেয়ের বরাতে রাজপুত্র নাই।—

সূর্য্যকান্ত উৎসাহ দিয়া কহিল ঘাবরাও কেন বন্ধু। এ সূজ্জি যখন রয়েছে তখন কোন ভাবনারই কারণ নাই।

গোষ্ঠ কহিল কি করে কি কর্ব্বে ঠিক করেছ?

সূর্য্য কহিল আমি রাণী দিদিকে ডেকে সব বন্দোবস্ত ঠিক করে নেব।

গোষ্ঠ কহিল আমার যে ভাই বড় ভাবনা হচ্চে, মেয়ে আমার ত সাজতে গুজতে মোটেই চাইবে না—তার উপর রংটাও ময়লা।

সূর্য্য একটা ধমক দিয়া কহিল—যাও আপনার কাজ দেখ গে, কোথায় মাছ দুধ ক্ষীর মেলে তার চেষ্টা করো!

গোষ্ঠ আর বেশী কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে বাড়ির বাহির হইয়া গেল। কিন্তু তাহার মনের ভিতরে উদ্বেগটা একটা শূলের মতই ফুটিতে লাগিল। একবার মনে করিল ছুটিয়া বাড়ী গিয়া মেয়েকে বলিয়া আসি মা এই কটা দিন যা বলি শোনো আমার কথা সে ঠেলিতে পারিবে না। আবার ভাবিল গনেশ হয় ত এতক্ষণ তাহাকে তাহার অবাধ্যতার জন্য প্রহার করিতেছে। মেয়ের কান্নাটাও যেন তাহার কানের কাছে স্পষ্ট বাজিয়া উঠিল গোষ্ঠ আর পথ খুঁজিয়া পাইল না। কোথায় দুধ

মাছের বন্দোবস্ত করিবে, ফিরিয়া আসিয়া বাহিরের পরচালি নামানো রোয়াকটায় কেমন বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া পড়িল।

সুজ্জি ছুটিয়া আসিয়া কহিল এলে দুধ ক্ষীরের খবর দিয়ে—

গোষ্ঠ অম্লান বদনে কহিল না!—

সুজ্জি রাগিয়া কহিল তবে থাকলো তোমার মেয়ের বিয়ে আমি চল্লাম।

বিহারী কহিল রাগিসনে ভাই—আমি যেন শোনলাম অণি আমার পথের ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদচে—তাই আর যেতে পারলাম না। এখন আর তার কান্না শুনতে পাচ্চিনে—

সুজ্জি কহিল এমন নীরেট মূর্খও তোমার মত দুটি যদি এ ভূভারতে থাকে মেয়েকে তোমার কোথায় সাজানো গোজান হচ্ছিল। এইবার তুমি সামনে দাঁড়াও তা হ'লে রক্ষে রাখবে!

গোষ্ঠ তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিল—আমি যাবো না ভাই তবে দেখিস সে মা হারা মেয়ে, তাকে কেউ যেন অনর্থক না বকে ঝকে, সে আবার বকা ঝকাটা মোটেই সইতে পারে না।—

বিহারী চলিয়া গেল!—

সৃজ্জি খুব গোপনে একটা ঘরের মধ্যে রাণীর মেয়ে মনমোহিনীকে তালিম দিতে লাগিল। মনমোহিনী দুবার অনিন্দ্যার নাম উচ্চারণ করিয়া কহিল তুমি যাও সৃজ্জি মামা। আমি অনিন্দ্যা এই নাম খুব বলতে পারবো!

সৃজ্জি কহিল দেখিস ভুলবি যদি বেত খাবি—আর ঐ অন্ধকারটাকে দাঁড় করালে জামাই ত সত্য সত্যই চলে যাবে তাতে ভুলটি নাই—মনমোহিনী নিজের রূপ খ্যাতিতে একটু গর্ব্বিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াই রহিল।

সৃজ্জি চুপি চুপি তাহার রাণী দিদিকে কহিল খবরদার রাণী দিদি রাত্রের বেলায় যদি তারা আসে একবারে এমন ধারা বেমালুম কাজ সেরে নেবো যে কাকে বকেও কেউ জানতে পারবে না!—

রাণীদিদি সৃজ্জির এই বুদ্ধি চাতুর্য্যে বিস্মিত হইয়া গেল!

সন্ধ্যার সময় সত্যই গাড়ী হাঁকাইয়া বর আসিয়া উপস্থিত বরের সঙ্গে আবার বরের একটী বন্ধুও আসিয়াছেন। সূর্য্যকান্ত সকলকেই যথাযোগ্য আপ্যায়নে আপ্যায়িত করিয়া চারিদিকে আহার উদ্যোগের ধূম লাগাইয়া দিল!—

বারীন বিনীত ভাবে সূর্য্যকান্তকে কহিল দেখুন আমাদের আজ রাত্রির মধ্যেই বাড়ি ফিরতে হবে। শুধু একবার মেয়েটিকে দেখা ছাড়া…

সূর্য্যকান্ত কহিল সে ত দেখবেই বাবা তার আগে দু পাঁচদিন না এখানে থেকে না মিষ্টি মুখ করিয়ে কি ছেড়ে দিতে পারি—

বারীন্দ্রের বন্ধু শেখর কলিকাতায় চাকরী করে, সপ্তাহান্তে বাড়ী আসিয়া থাকে, সে ত একথায় একবারে আঁৎকাইয়া উঠিল। তাহার উপর তাহার প্রেয়সী সবে এই কয়েকদিন মাত্র পিতৃগৃহ হইতে স্বামীগৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। ব্যস্ত হইয়া কহিল, আপনাদের খাওয়া দাওয়ার কোন যোগাড় করতে হবে না। আমরা এক্ষুনিই চলে যাবো।—মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য মেয়েটিকে দেখা; বলিয়া আজকাল এই যে ফ্যাসানটা উঠিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে অনেকখানিই প্রতিকুল সমালোচনা তুলিয়া গেল। কহিল, "এ একবারেই বিশ্রী ইহার তুলনায় সেকাল কত ভাল ছিল।

আসল কথা ঘড়ির কাঁটা তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল—নহিলে নিজের বিবাহেও ক'নে দেখিতে তিনিও কসুর করেন নাই।

সূর্য্যকান্ত কহিল "বিলক্ষণ—এই এত উদ্যোগ আয়োজন একি মাটি হবে বলতে চাও বাপু সকল—যদি একান্তই না থাকা হয়, কাল ভোরে বরং রওনা হবার কথা বলতে পারি।"

শেখর বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বারীনের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "ভাই ব্রাদার তুমি এখানে তিষ্ঠহ। আমার যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন, রাত্রি দশটার মধ্যে বাড়ী পৌছিতেই হবে।

বারীন জনান্তিকে জানাইল তবে মেয়ে নিয়ে এসে দেখানর ক্ষতিটা কি ?—

সূর্য্যকান্ত কহিল, "এই সন্ধ্যার আঁধারেই—?"

শেখর কহিল, "তাতে বেশী কিছু বাধবে না—মুখের চেহারাখানা ত দেখে নিতে পারা যাবে—রং কালো হলেও শুধরে নিতে পারা যায়, কিন্তু মুখখানা—ওর নাম কি—

সূর্য্যকান্ত মেয়ে আনিতে আদেশ করিল। মেয়ে আগে হইতেই সাজানো গোজানো ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি ছোট মঙ্গলঘট হাতে লইয়া কন্যা আসিয়া তাহাদের চরণে প্রণতা হইল।

বারীন কন্যার নাম জিজ্ঞাসা করিল—

অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর আসিল "অনিন্দ্যা সুন্দরী"।

শেখর সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "পরিষ্কার নাম।"

বিহারী ঘোষেদের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই সূর্য্যকান্ত ভাবী জামাতাকে কিছু সামান্য জলযোগ করাইয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিল।

গ্রাম ছাড়িয়া গাড়ী যেখানে নদীর বাঁকের কাছে ঘুরিয়া অদৃশ্য হইবে সেইখানে একটা বালীর ঢিবির উপর দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কয়েকটি বালক ও বালিকা গাহিয়া উঠিল।—

"বঁধু-কখন এলি, কখন গেলি, কখন ধরলি বান
কোন্ ফাঁকেতে বিঁধে নিলি বুনোপাখীর প্রাণ?

বলা উচিত এ গান তাহারা গ্রামোফোনের রেকর্ডেই শুনিয়াছিল।

গোষ্ঠবিহারী গ্রামান্তর হইতে দই দুগ্ধের বায়না দিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল পথেই কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে কহিলেন, "আয় মা—রাস্তায় দাঁড়িয়ে আজও কি তোর গোলমাল করবার দিন আছে—চল্ ঘরে যাই।"

অনিন্দ্যা পিতার হাতটা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "না বাবা আমিত গান গাইনি, দত্তবুড়ি ফটকে দাকে শিখিয়ে দিলে, তাই ফটকে ওদের পেছন পেছন গেয়ে এলো—

গোষ্ঠ কহিল, "বেশ চল্!"

কন্যা দেখার পর্ব্বটা যখন গোষ্ঠবিহারী শুনিল খুব সহজেই মিটিয়া গিয়াছে তখন গোষ্ঠ বুঝিল তাহার কন্যার অদৃষ্টে একবারে নিরধার দুঃখই নাই, সুখের মুখ সে দেখিতে পাইবে।

পাড়ার লোক শত মুখে প্রশংসা করিয়া কহিল যদি অনির ওখানে বিবাহ হয়, তবে বল্‌তে হবে তার বহু ভাগ্যি, অনেক দিন শিব পূজা করে তবে এমন বর পাবে। এমন গড়ন সৌষ্ঠব পুরুষ সচরাচর চক্ষে ঠেকে না বলিলেই হয়।—

গোষ্ঠ মনে মনে সকলের কাছে কৃপা ভিক্ষা করিয়া কহিল—"তোমরা আশীর্ব্বাদ করো আমার কালো মেয়ের জীবন সুখময় হউক!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। কিন্তু গাত্র হরিদ্রার পূর্ব্বরাত্রে অনিন্দ্যা এমন বাঁকিয়া, কাঁদিয়া, কাটিয়া অনর্থ করিতে লাগিল, কার সাধ্য তাহাকে সান্তনা দেয়—তাহার পিতা আসিতেই পিতার গলাটা জড়াইয়া কহিতে লাগিল বাবা এম্‌নি করেই কি এই অভাগী মেয়েটাকে বিদেয় করতে হয়—মা থাকলে তুমি এম্‌নি পারতে?—

অনিন্দ্যার পিসী মুখটা বাঁকাইয়া কহিল মেয়ের সব ন্যাকামী, তের চোদ্দ বয়স হ'তে গেল—বিয়ে করতে হবে

তা জানেন না?—পড়শীর আর আর অনেক কন্যাবতী জননী, কতকটা গোষ্ঠবিহারীকে শোনাইয়াই কহিতে লাগিল তাহাদের গর্ভে এইরূপ কন্যা জন্মিলে তাহাকে সূতিকা গৃহেই নুন দিয়া মারা হইত।

গোষ্ঠ কন্যাকে বুকে করিয়া বাহির হইয়া গেল। বুঝিল চারিদিক হইতে একটা ভাবী বিভীষিকা, কন্যাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।

এমন সময় জামাই বাড়ী হইতে আইবুড় ভাতের তত্ত্ব লইয়া আট দশটা লোক গোষ্ঠ বিহারীর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সতরঞ্চী গালিচা খেল্‌না পুতুল হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড় সাবান বাস তৈল গল্পের বহি কিছুই বাদ যায় নাই। বিহারী সাগ্রহে কন্যাকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া দেখাইতে লাগিল। এই দেখ মা তোমার শ্বশুর শাশুরীরা কত ভালবাসেন তোমায়—তুমি যা চাও বাসতেল সাবান তরল আলতা রেশমী চুড়ি—কাপড়···

অনিন্দ্যা কাপড় চোপড় দুবার নাড়িয়া চাড়িয়া কহিল এসব আমার কিছুতে দরকার নাই বাবা। তুমি বলে দাও বর যেন পাল্কী চড়ে আমাদের বাড়ী না আসে, বিহারী হাসিয়া কহিল আমি বলে দেব বর আসবে না, কিন্তু তার আগে তোকে ত কাল গায়ে হলুদটা নিতে হচ্চে।

অনিন্দ্যা কহিল শুধু গায়ে হলুদটা ত ?

বিহারী কহিল হাঁ !

অনিন্দ্যা কহিল তা আমি নেব বাবা, কিন্তু বিয়ে কিছুতে করবো না, তা'বলে রাখছি, বিয়ে দিলে দেখিস্ বাবা আমি মরে যাবো !

ফুটিয়া বলিবার ভাষা অনিন্দ্যার নাই—নহিলে তাহার অনুভব হইতেছিল, যেন তাহার বুকের ভিতরটা আঁধার হইয়' আসিতেছে। যেন এই বিবাহ বাড়ীর আনন্দ কোলাহলের পশ্চাতে একটা আকাশ ভরা হাহাকার তাহারই জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে—এ রোশনাই আলো —বাদ্যি ঘণ্টা, যেন তাহাকেই সমারোহের সহিত বিসর্জ্জন দিবার জন্য—প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহার একটা কথা আপনার মনেই উঠিত, পড়িত, যে কালো মেয়ের সুখ এ জীবনে নাই। তাহাকে বাবা ছাড়া কেহ ভাল বাসে না আর বাসিবেও না ! তাহার সমবয়সী পিস্তুতো ভগ্নী মোহিনী যদিও একবার চুপে চুপে বলিয়া গেল শ্বশুররা তাহার, তাহাকে খুব ভাল বাসিবে কিন্তু কথাটা তাহার যেন কেমন বিশ্বাস হইল না, তাহার মনে হইল যেন, সবাই আজ মিষ্টি কথার ছদ্মবেশে তাহাকে ভুলাইতে আসিয়াছে।

তবু হাজার চক্ষের জলের নিষেধ সত্ত্বেও তাহার গাত্র-

হরিদ্রা হইয়া গেল, এবং পড়শীরা আইবুড়ো ভাতের নিমন্ত্রণও খাইয়া গেল! অনিন্দ্যা বুঝিল আর তাহার নিষ্কৃতি নাই। তাহাকে সাত সমুদ্র পারের দেশে যাইতেই হইবে; কোথায় রহিবে গ্রামের অশত্থ বৃক্ষের শীতল ছায়া, কোথায় রহিবে রাধা গোবিন্দজীর ভাঙা নাটমন্দির, ঘরের পাশের নদিটীও আর, সে দেখিতে পাইবে না। ফটিক্ গণেশ তাহারাও কেহ তাহার খোঁজ লইতে যাইবে না! রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে সিংহ বাহিনীর পাটা-তনের উপর মাথা লুটাইয়া কহিতে লাগিল, হে মা দুর্গা তোমার পায়ে পড়ি মা, আমার বিয়ে ভেঙ্গে দাও। নয় তোমার খাঁড়া দিয়ে আমায় কেটে ফেল। আমি এদের ছাড়িয়া ত যাইতে পারিব না,—কিছুতে না।

মোহিনী-ই ছিল এখন অনিন্দ্যার প্রহরী, খুঁজিতে আসিয়া দেখিল—অনিন্দ্যা ঠাকুরের পাটাতনে ঢ্ক ঢুক করিয়া মাথা খুঁড়িতেছে।

মোহিনী খুব খানিক তিরস্কার করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল।

অনিন্দ্যা দেখিল কোথাও নিস্তার নাই মা, সিংহবাহিনীও তাহার বিপক্ষে—বালিকার যাহা শেষ অবলম্বন, চক্ষের জলেই বুক ভাসাইতে লাগিল!

সহসা দ্বিপ্রহর রাত্রে পাত্রবাটি হইতে সংবাদ আসিল পাত্রের মাতা কন্যার রং কালো শুনিয়া বিবাহ স্থগিত রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, যদি আর দুইশত টাকা কন্যার রংএর দরুণ ধরিয়া দেওয়া হয় তবেই বিবাহ হইবে, নচেৎ নয়।

বিহারীর ত একবারে চক্ষু স্থির!—সূর্য্যকান্ত ও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না—ভদ্রলোকের ব্যবহারে এমন দুর্ব্যবহার আসিতে পারে—যে লোক এ সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল তাহার কাছেও তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ লইয়া যখন জানা গেল কথা একবারে খাঁটি, স্বয়ং পাত্রের মাতা এ হুকুম জারী করিয়াছেন। তখন সূর্য্যকান্তকেও একটু ভাবিতে হইল। গোষ্ঠকে কহিল গোষ্ঠদা, কাজ যখন আরম্ভ করা গেছে তখন ছেড়ে দেব না। তবে তাদের ভদ্র-আনীর বহরটা খুব দেখা গেল, পাত্রও স্বয়ং কন্যা দেখতে এসেছিলেন, অথচ গায়ে হলুদের পর বল্লেন কিনা অমত—আচ্ছা শেষ তাকাত লড়ে দেখা যাবে।

এত রাত্রি পর্য্যন্ত অনিন্দ্যাও ঘুমায় নাই, জাগিয়াছিল বাহির হইয়া আসিয়া কহিল বাবা কোথায় তুমি এত টাকা পাবে, বনের হরিতকীর সঙ্গে বিয়ে দিলে ত আর টাকা খরচ হতো না! ওদিকে বিদেয় করে দাও।

এত রাত্রি পর্য্যন্ত অনিন্দ্যা জাগিয়াছিল দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া গেল। অনিন্দ্যার পিসী কহিল মাগো ভদ্রমানুষের ব্যবহার দেখে যা বোঝা যাচ্চে, তাতে আনন্দ ঠিকই বলেছে, বনের হরিতকীই একালের মেয়েদের উপযুক্ত বর! সূর্য্যকান্ত কহিল দাঁড়াও তোমরা গোলমাল করো না। আমি শুদ্ধ একবার বারুইপুর গিয়ে দেখে আসছি—গোষ্ঠ কহিল আর গোলমালেও কাজ নাই দু'হাজার টাকা যদি দিতে পারলাম, আর "বোঝার উপর শাক আঁটি" দুইশত টাকায় কত বাধবে বলগে—দেবো, সূর্য্যকান্ত কহিল দেবো বল্লেই দেওয়া হবে—হলো না হয় তারা বড়লোক, তবু আদালত খোলা রয়েছে!

গোষ্ঠ ব্যস্ত হইয়া কহিল ওকথা মনেও ঠাঁই দিও না ভাই, এখন আমরা মেয়ের বাপ্‌ তারা বরের বাপ্‌ এখনও কতকাল এই দেশে মেয়ের বাপদের পরে এই রকম লাঞ্ছনা চলবে—পার্ত্তাম যদি মেয়ের বিবাহ বন্ধ করতে—মেয়ে, যদি স্বয়ম্বরা হবার সুযোগ পেতো, তাহলে কথা ছিল, কিন্তু তাতো উপায় নাই! একটা পাঁজর ভাঙ্গিয়া দীর্ঘশ্বাস আকাশের উপর দিয়া ঈশ্বরের দরবারের দিকে ছুটিয়া গেল। ভোর রাত্রে টাকা লইয়া বারুইপুরের লোক চলিয়া গেল।

আর মধ্যে দিনমানটা মাত্র বাকী। রাত্রির বেলাতে রাজা জামাই আসিয়া উপস্থিত হইবেন। নিজের দৈন্য যেন চারিদিকে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে বিভীষিকা জাগাইতে লাগিল! বিহারী, যে আসে সকলকেই বলে কাজে লাগিয়া যাও, কিন্তু নিজে যে কোন্ কাজে লাগিয়া পড়িবে—তাহার ঠিকানা করিতে পারে না! দেখিয়া শুনিয়া সূর্য্যকান্ত ও রাসবিহারী গোষ্ঠকে একটা ঘরে পুরিয়া রাখিয়া কহিল।—তুমি এইখানে পড়ে থাকো—বাইরের কোন কাজ দেখার প্রয়োজন তোমার নাই। লুচি ভাজা হতে ঝাড় লণ্ঠন টাঙান পর্য্যন্ত সব আমাদের পরে ভার।

গোষ্ঠ কহিল আমায় বাঁচালি তোরা। অনিন্দ্যাকে ডাকিয়া কহিল একবার আয় মা—আজ শেষ তোকে বুকে করে নেই—কাল থেকে ত পর হ'য়ে যাবি। রাণীসুন্দরী এই সময় এ-ধার দিয়া কোথায় যাইতেছিল, কথাটা তাহার কাণে গেল, হন হন করিয়া আসিয়া কহিল।—বলি হাঁগা দাদা তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে কি লোপ পেয়ে গেছে? মেয়ের বিয়ে ত্রিসংসারে কেউ দেয় না? তোমার মুখ দিয়ে বেড়ুচ্চে ওসব কি অমঙ্গুলে কথা—

গোষ্ঠ কহিল তোরা গোলমাল করিস্‌নে—সত্যই বিয়ে

দিলেই মেয়ে আর আপনার থাকে না। কাল হোক দুদিন পরেই হোক মেয়ে পরই হয়ে যায়—তাতে যে মাবাপের, কোন কষ্ট আছে তা নয়, তবে কি জানিস্ তবু কাঁদ্‌তেও হয়—

অনিন্দ্যা তাহার পিতার পায়ের কাছটিতে বসিয়া পড়িয়া কহিল বাবা তুমি আমায় শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ো না আমি কক্‌খনোই সেখানে যাবো না! তোমার মত ত কেউ ভালবাসবে না বাবা।

গোষ্ঠ কন্যার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিল অনিন্দ্য কাঁদিসনি মা আমি যে এত টাকা খরচ করচি, সে তোরি চকের জলের দিকে চেয়ে, আমি ব্রহ্মময়ীকে ডাকচি—আমার ব্রহ্মময়ীর চখের জল তিনি মোছাবেনই—

ঝাড় লণ্ঠন বাদ্যি ঘটা করিয়া জামাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বরযাত্রীর দল বাইজীদের লইয়া একটা বাড়ীতে নৃত্যে পড়িয়া গেল। ক্রমে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত, অনিন্দ্যা বুঝিল আর তাহার নিস্তার নাই। কোথাও যে পালাইবে তাহারও পথ, পাঁচজনে বন্ধ করিয়াছে সর্ব্বদাই তাহার চারিধারে কড়া পাহারা—

অনিন্দ্যার মনে হইল, যেন তাহাকে বন্দী করিতেই চারিদিক হইতে এত সমারোহ করিয়া সকলে আসিয়াছে

অনিন্দ্যা একঘটি জল খাইয়া বলিল, বাবাকে একবার ডেকে দাও।

পিতা আসিয়া কহিল; কিছুই ভয় নাই মা তোমার একবার বিবাহটা ত হয়ে যাক তারপর দুদিন পরে আবার যে তোমার ঘর সেই ঘরেই এসে থাকবে। অনিন্দ্যা চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে ছাঁদনা তলায় বসিল। এই জ্ঞানহীনা বালিকাই তাহার প্রিয়তমের গলে বরমালা দিবে!

পুরোহিত একগাছি ফুলের মালা দিয়া দুইজনের হাত বাঁধিয়া দিয়া শালগ্রাম শিলার সম্মুখে—মন্ত্রপাঠ করাইতে লাগিলেন, অনিন্দ্যা একটা মন্ত্রও উচ্চারণ করিল কিনা সন্দেহ। বরদেবতাই দুই একটী মন্ত্র বলিল!—তাহারও মনে কেমন একটা সন্দেহ বাজিতেছিল যে মেয়ে সে দেখিয়াছিল—সেই মেয়ে-ত এ-নয়—এযে একবারে কালো বরণ।—

বারীন একবার ভাবিল, রাত্রি জাগিয়া হয়ত তাহার দৃষ্টি বিভ্রম হইয়াছে!—আবার ভাবিল অল্পে অল্পে লোকের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহার সঙ্গে দেখিতেছি ঠিক মিল হইয়া যাইতেছে, কিন্তু কালো বরণের দরুণও দুই শত

টাকা মূল্য ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। আর তাহার বলিবার পথ ত কিছু নাই।

বাসর ঘরে ঢুকিয়া তাহার সব দ্বন্দ্ব মিটিয়া গেল বুঝিল মস্ত একটা ফাঁকি! ফাঁকির সেরা এই যে—জাল মেয়ে দেখাইয়া তাহার বিবাহ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। গোঁজ হইয়া মুখটা ভারী করিয়া বসিয়া রহিল।

প্রতিবেশিনীরা আসিয়া কহিতে লাগিল, ওহে বর মুখটা একটু খোল, কাল ত সকালে আমাদের অনিন্দ্যাকে নিয়ে পালাবেই জানি, তবু আমাদের মধ্যে ত এতদিন সে ছিল, দুটো কথা কও—মনে ধরলো কি না বলো, ও-ত বহু জন্ম শিব পূজা করে এমন গুণ নিধিটিকে পেয়েছে—

বর পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল।

মোহিনী বাহির হইতে জানালার ধারে দাঁড়াইয়া কহিল গঙ্গাকে ডাব ফুটকড়াই মানো তবে যদি কথা কন—

কথার আওয়াজটা যেন কোন পরিচিতার মতই বারী-নের কাণে গেল। বারীণ খাড়া হইয়া উঠিয়া কহিল ও মেয়েটি কে—

রাণী সুন্দরী প্রতিবেশিনী দিদি সাজিয়া, বাসরে আসিয়া ছিলেন তিনি প্রথমটা আসিতে চাহেন নাই, তবে তাঁহার

গলা সম্বন্ধে একটা খ্যাতি আছে বলিয়া পাঁচজনে ধরিয়া আনিয়াছিল। রাণীসুন্দরী কহিলেন ও তোমার সম্পর্কে ঠাকুরঝী হয়।

বারীণ কহিল বিবাহ হ'য়ে গেছে কি?

রাণী কহিল না।—

বারীণ কহিল মেয়ে দেখতে এসে আমার মনে হ'চ্চে ঐ মেয়েটিকেই যেন দেখেছিলাম, তাইতে আমার পছন্দও হয়েছিল।

রাণী একমুখ হাসিয়া কহিল বল কি, তা হলে ওর বরাত বলতে হবে। কিন্তু জেনো ভাই তুমি যা ভাবছো তা মোটেই সত্য নয়! আর আমাদের অনিন্দ্যাই বা কি মন্দ হে—রং টুকুই যেন একটু ময়লা,তা-এ—পাড়াগাঁয়ে রোদবাতাসে ঘুরে বেড়ায়, একটু বয়স হ'লে আর যত্নে থাকলে, দেখবে—ওই কালো রূপের জন্যই পাগল হতে হবে। অনিন্দার ঘোম্‌টাটা খুলিয়া দেখাইয়া কহিল, দেখ দেখি চোক মুখের গড়ন!—যেন ঠাকুরুণটি।—অনিন্দ্যা তখন দুই চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেছিল।—

সারা রাত্রি, একরকম বিনিদ্র অবস্থায় থাকিয়া বারীণ সকাল বেলায় বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শেখরকে

ডাকিয়া অক্ষেপের সুরে কহিল। তোমাদের মত আমি শুধু বরযাত্রী হয়ে এলেই ভাল করতুম, রাজশেখর—

রাজশেখর কহিল কেন হে। প্রেয়সী তোমার···

বারীণ কহিল চুপ কর্ ভাই সে কি আর একটা মেয়ে মানুষ! আমি টাকার তোড়া বিবাহ্ করেছি, টাকা নিয়েই ঘরে ফিরে যাই।

রাজ শেখর কহিল কেন হে রং একটু ময়লা হলেই বুঝি সব মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল। ভিতরটা একটু পরখ ক'রে দেখ, তা'রপর বলো—রাজশেখর দুটা উদাহরণ ও বিশেষণ দিয়া দুকথা বেশ বুঝাইয়া দিল। বারীণ একটা কথাও শুনিতে চাহিল না। কহিল ওহে রাজ-শেখর যদি বন্ধু ব'লে শ্রদ্ধা করতে চাও, তবে এই বৎসরের মধ্যে আর একটি মেয়ে দেখে দিও। অন্ধকারের সঙ্গে ঘর কন্না সে কিছুতে আমি করতে পারবো না।

শেখর কহিল আচ্ছা —

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিদায়ের সময় পিতা পুত্রী উভয়কেই বোঝানো দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। অনিন্দ্যাকে যদিও কাপড় চোপড় গহনা

গাঁটি পরাইয়া একরকম থে থাম করিয়া রাখা গেল। কিন্তু গোষ্ঠবিহারীকে কিছুতে বোঝান গেল না। এদেশের রীতি ছিল মেয়েকে বিদায় দিবার সময় পিতাকে কতকগুলি ইঁদুরমাটী লইয়া মেয়ের সামনে দাঁড়াইতে হইত। কন্যা বলিত এতদিন যা খেয়েছি তোমার, তা এই মাটী দিয়ে শোধ দিলাম।

গোষ্ঠবিহারী মাটি চারটি হাতে করিয়া, ভাবিতেছিল মেয়ের মুখ হইতে কি করিয়া এই কথা শুনিয়া লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবে। এত দিনকার দেনা পওনা এক-মুষ্টি মাটিতেই চুকিয়া যাইবে? আর বাপ্ যে এত স্নেহ করিয়াছে, বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, তার পরিণামে মাটিছাড়া কিছুই নাই? জীবনটা যেন তাহার দীর্ঘ শ্বাসের পাথর দিয়া গড়া বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

সময় বহিয়া যায় দেখিয়া রাণী সুন্দরী তাহার দাদার হাতটা চাপিয়া কহিল। দাদা ভাব্‌বার সময় নাই। মেয়ের কাছ হতে মাটি ফিরিয়ে নাও! বিদায় দিতে হবে! গোষ্ঠ চক্ষু মুছিয়া কহিল দাঁড়া আমি ভাব্‌ছি, এই মা হারা মেয়েকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলাম মেয়ে আমার মাটি দিয়ে শোধ নাই দিলে; এমনি শ্বশুর ঘর হ'তে আসুক না—

সূর্য্যকান্ত একটা ধমক দিয়া কহিল, ওহে বিহারী তোমার কান্না কি কিছুতে গেল না, মেয়েকে যদি কোন রকমে ঠাণ্ডা করে নেওয়া গেল, তোমায় ঠাণ্ডা করবে কে বল দেখি—মাটি নিয়ে ভাবছো কি, জানো না—? জীবনটাই যে মাটি দিয়ে তৈরি—তুমিও মাটি, তোমার মেয়েও মাটি, আর দেনা পাওনার শোধ বোধও ঐ মাটি দিয়ে—কাজ সেরে ফেল শীগ্‌গীর—এ আমাদের হিন্দুর নিয়ম, চক্ষের জলের বর্ষণ দিয়া মাটি পর্ব্বটা শেষ হইয়া গেল যদি, মেয়ে তখন পিতার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল গোষ্ঠও চোখের জল মুছিয়া কহিল, কাঁদিসনি মা তিন দিন পরে তোমায় নিয়ে আসবো।

রাণীসুন্দরী জামাই বারীন্দ্রমোহনের হাত ধরিয়া কহিল—দেখ বাবা, অনিন্দ্যা এখন তোমার হাতেই পড়লো, তুমিই এখন তার ইহকাল, পরকাল, সর্ব্বস্ব—যেন অনাদর না হয়, যেন কালো বলে পায়ে ঠেল না; মেয়েমানুষের স্বামী ছাড়া অন্য গতি নাই।

বারীন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এই ইনিই আবার গতরাত্রে বাসর জাগাইয়াছিলেন। বেহারারা পাল্কী তুলিয়া দিল। ইংরাজী বাজনা, মাদ্রাজি বাজনা সব এক সঙ্গে এক তালে বাজিয়া

উঠিল, বিহারী ভাবিল তাহার হৃদয়বনের কমলটিকে তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য এ কি সমারোহ আসিয়াছিল। এ যে সবাই উন্মত্ত হইয়া সন্মুখেরদিকে চলিতেছে। এই পিতার হৃদয়টার পানে ত কেহ ফিরিয়াও চাহিল না। বিহারী নিজেই আকুল হইয়া নিজের মাথার চুল টানিয়া ছিঁড়িতে লাগিল।

পাড়াপ্রতিবেশী, রাণীসুন্দরী সকলে বিহারীকে বুঝাইতে আসিল, বিহারী কাহারও কথা শুনিতে পারিল না। কহিল, তোমরা একটু আমায় নিষ্কৃতি দাও, ওর মায়ের কান্নাটাও যে আমারি কাছে জমা করা আছে। আমি একটু কাঁদি, ওর ত আমি শুধু বাবা নই, অনেকখানা মাও যে বটি।—

সকলে ব্যথিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

গোষ্ঠ মেয়ে মানুষের মত বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মা আমার আঁধারঘরের মাণিক ছিল, আমার কালোরূপে ভুবন আলো করিয়া ছিল। ইত্যাদি—



পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অনিন্দ্যা শ্বশুরবাড়ী আসিল, আসিতেই তাহাকে কেন্দ্র-মণ্ডলে রাখিয়া, চারিদিক হইতে তারস্বরে এমন সব বচন সুধা ক্ষরিত হইতে লাগিল যে, অনিন্দ্যার মনে হইল আগুনের খাপড়ার উপর পড়িলে বুঝি ইহার চাইতে ভাল হইত। সে তাহাদের সংসারে প্রবেশ করিল না, কোন কাজের গায়েই হাত দিল না—অথচ তাহার দোষের সংখ্যা নাই। প্রথমতঃ বিবাহের দানসামগ্রীগুলাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার পিতার উপরে খুব একচোট বর্ষণ হইয়া গেল—বেচারা গোষ্ঠ এখানে উপস্থিত ছিল না তাই রক্ষা—নহিলে সর্ব্বস্ব খুয়াইয়া কন্যাকে কোথায় সমর্পণ করিয়াছে, বুঝিয়া শরশয্যা আশ্রয় গ্রহণ করিত।

বাগদীদের পাতাসী অনিন্দ্যার সঙ্গে আসিয়া ছিল—অনিন্দ্যা পাতাসীকে কহিল "ও পাতাসী তুই বাড়ী যা, গিয়ে বাবাকে পাঠিয়ে দিগে, আমার এখানে আর একদণ্ড মন টিকচে না।"

পাতাসী চুপে চুপে আশ্বাস দিয়া কহিল—ভয় করো না দিদি, দেখ ত বিকাল বেলায় তিনি এলেন বলে—

অনিন্দ্যার কিন্তু একদণ্ড মন তিষ্ঠিতে ছিল না—যদিবা

শ্বশুর বাড়ী বলিয়া থাকিতে পারিত, তবু চারিদিক হইতে এই অজস্র বাক্যবাণ যে একবারে অসহ্য—অধম ঝি মাগী গুলা পর্য্যন্ত তাহার রূপ লইয়া ব্যঙ্গ করিতে লাগিয়াছে। অনিন্দ্যা বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার উপর শুনিতে লাগিল, তাহার বর দেবতাটিও এই কালো মেয়েকে বিবাহ করার লজ্জায়, ঘরে থাকিতে চাহিতেছেন না।

অনিন্দ্যা সংকল্প করিল—পলাইতে হইবে। আর ক্রন্দন নহে। তাহার সেই পূর্ব্বজীবন যেন ফিরিয়া আসিতে লাগিল। সেই মুক্ত বিহঙ্গমের মত উদার—উন্মুক্ত অবাধ জীবন!—

আসিয়া অবধি দুইদিন ধরিয়া কাহারও সহিত বড় একটা আলাপ করিতে পারে নাই;—তাহার বড় যা দুইবার যাহা খাওয়াইয়া যাইত। নহিলে পাতাসী ব্যতীত তাহার কথা কহিবারও সুযোগ কাহারও সহিত ছিল না। আর যাহারা বালক বালিকা কথা কহিতে আসিত রূপের কথা তুলিয়া তাহারাও, অনিন্দ্যাকে খাটো করিবারই চেষ্টা করিত। ভাল কথা বলিতে পারে এমন পাড়া-প্রতিবেশীরা আপনার আপনার গৃহ কাজ লইয়াই ব্যস্ত। অনিন্দ্যার মনে হইতে লাগিল যেন এ মরুভূমির দেশ। এখানে একটা সহানুভূতি নাই, একটা মিষ্ট বাক্য নাই,

আছে শুধু রূপ লইয়া আলোচনা—মাগো কালো মেয়ে কি ভূভারতে জন্মায় না ?

কথা ছিল অষ্টমঙ্গলা পর্য্যন্ত থাকিয়া, পাতাসী অনিন্দ্যা ও জামাই বারীনকে লইয়া জোড়ে পুষ্পগ্রামের বাড়ী ফিরিবে, কিন্তু অনিন্দ্যা যখন কেবলই ব্যস্ততা দেখাইতে লাগিল, তখন বাধ্য হইয়া পাতাসীকে বিদায় লইবার জন্য গিন্নীর কাছে অনুমতি চাহিতে দাঁড়াইতে হইল।

কাত্যায়নী কহিলেন, "ওমন মেয়েকে যে বাড়ী হ'তে বিদায় করতে পেরেছে ওর বাপ, তাই ঢের—আবার নিয়ে যাওয়ার কথা কেন? ও অসভ্য মেয়েকে নিয়ে কতকাল যে ভুগতে হবে জানিনে, একবারে চাল চলন হতে সব বেয়াক্কার! আমাদের অমন ছেলের জন্য অমন মেয়েও ভগবান রেখেছিল;—হায়রে টাকা! তুমি মেয়ের বাপকে ব'লো, নিয়ে যাবো বল্লেই অমনি পাঠানো হবে না—দানসামগ্রী যা দিয়েছে ফিরিয়ে নিয়ে যদি ভাল বদলে দিতে পারে, তবেই পাঠাবো নইলে নয়।—দেখি বাপ সোহাগী মেয়ের বাপের সোহাগ কতদূর পর্য্যন্ত পৌছায়—

অনিন্দ্যা পাতাসীকে কহিল, "পাতাসী, তুই কেবল বাবাকে পাল্কী নিয়ে আসতে বলবি আর কিচ্ছু না—"

কাত্যায়নী তাহার ঠাকুরঝির হাতটা ধরিয়া হড়্‌হড়্‌ করিয়া টানিয়া আনিয়া কহিল, "ঠাকুরঝি, দেখ একবার মেয়ের বুকের পাটাটা দেখ! রাক্ষুসে মেয়ের ভয়ের একটু লেশমাত্র নাই—দৃঢ় হস্তে অনিন্দ্যার এলোচুলের কয়েক গোছা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন "আমার সামনে কথা কইতে তোর একটু বাধলো না? ধরে, বেঁধে, যদি এইখানে রোদে ফেলে রাখি, দুই বেলা করে চাবুক দিয়ে চাবকাই, তোর বাবার—বাবার সাধ্য আছে—নিয়ে যেতে পারে?"

অনিন্দ্যা শাস্তির বহরটা শুনিয়া সেইখানটায় পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ও-গো বাবা গো তুমি কোথায় আছো এরা আমায় মেরে ফেল্লে—শাশুড়ীর হাতটা ঠেলা দিয়া আছাড় বিছাড় করিয়া পড়িতে লাগিল। পাতাসীও থামাইতে পারিল না।

সহসা চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর সকলেই চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কাত্যায়নীও রাগের মাথায় কসিয়া দুই চড় লাগাইয়া দিলেন। বাড়ীময় লোক ভর্ত্তি হইয়া গেল। কাত্যায়নী জনে জনে কহিতে লাগিলেন, "এই ঠাকুরঝিকে জিজ্ঞেস করো, ওই কোয়াকেরে মেয়েকে কি বলিছি, শুধু বলেছি এখন পাঠাবো না—এতেই এতো?

কর্ত্তাও এসময় এখানে কান্না শুনিয়া উপস্থিত হইলেন। কাত্যায়নী গলায় কাপড় দিয়া কর্ত্তার পায়ে মাথা নোয়াইয়া কহিলেন, তুমি এমন সর্ব্বনেশে মানুষ গো—আমার তেমন সোনারচাঁদ ছেলের গলায়, এম্‌নি একটা কালো পেঁচা বেঁধে দিয়েছো—ও গো তোমার টাকাই এত বড় হলো—?

কর্ত্তা কোন কথা কহিবারই সুযোগ খুঁজিয়া পাইলেন না। পাতাসীকে কহিলেন "ওগো বাছা মেয়েটিকে তুলে মুখে জলটল বাতাস টাতাস দাও? তার পর বাড়ী যাও, গিয়ে মেয়ের বাপকে পাঠিয়ে দাওগে, যা হয় পাঠানো না পাঠানো, তিনি এলে সব বন্দোবস্ত ঠিক করা যাবে।

কাত্যায়নী রাগিয়া কহিলেন, "তুমিই যত নষ্টের গোড়া।"

কর্ত্তা কহিলেন, "আমি না তুমি? আমি দরদস্তুর করে ছিলাম? না তুমি করেছিলে? দুই হাজার টাকা আর দুইশত টাকা, এক দুই করে, গণে কে ঘরে তুলে-ছিল?...

গিন্নী কহিলেন, "আমি না হয় টাকাটাই গণে ঘরে তুলেছিলাম—কি দর ঠিক করেছিলাম—মেয়ে ত তোমরাই দেখে এসেছিলে।"

কর্ত্তা কহিলেন, "তা'ও তোমার পুত্র।"

জনৈক প্রতিবাসিনী কহিলেন, "আরও তোমাদের কর্ত্তা গিন্নীর ঝগড়া বাধিয়ে কাজ নাই, যা হয়ে গেছে তা ত ফিরবে না। এখন বধুকে বুঝাও, শিখাও। এই মেয়ে নিয়ে ত ঘর করতে হবে।"

কাত্যায়নী হাত নাড়িয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, কখনও না—এই বৎসরে ছেলের আবার বিয়ে দিয়ে নিয়ে আসবো—তবে ছাড়বো। ঐ মেয়ে নিয়ে বাঁদীনকে ঘরকন্না করতে দেবো,—আমি বেঁচে থাকতে নয়। এইখানেই ওকে রাখবো আর বাঁদিগিরি করাবো।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্যাতাসী পুষ্পগ্রাম চলিয়া গেল। সারাদিনমানটাই অনিন্দ্যা একরূপ খায় দায় নাই। অপরাহ্ণ বেলায় তাহার মা রমা যাহা দুইটি খাওয়াইয়া গিয়াছিল! শাশুড়ীর কড়া হুকুমে তাহারও দুদণ্ড কাছে বসিয়া উপদেশ দিবার, কি তাহার বেদনার উপর একটু স্নেহের হাত বুলাইবার অবসর তাহার নাই।

সন্ধ্যার আঁধার, অনিন্দ্যার বুকের উপরেও যেন আঁধার ঘনাইয়া আনিতে লাগিল। ওদিকে পশ্চিম আকাশের গায়ে খানিকটা কালোমেঘ জমিয়া উঠিতেছিল, অনিন্দ্যার মনে হইল ওটা যেন কালো পাহাড়ের মত তাহার মাথার উপর এখনি ভাঙ্গিয়া পড়িবে!

এদিকে সম্মুখে ফুলশয্যারও রাত্রি,বাড়ীতে ফুলের মালা ও ফুলের ছড়াছড়ি হইয়া যাইতেছে। যাহাকে লইয়া ফুলশয্যা হইবে সেই শুধু বঞ্চিত। অনুষ্ঠানটা পূর্ণ হইবে বটে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন হউক না হউক তাহা দেখিবার কাহারও আবশ্যক নাই। পুষ্পময়ীর খোঁজ নাই, কিন্তু অভিনয় চলিবে। এই প্রাণহীন তাণ্ডবোৎসবে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত মাতিয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যার সময় অনিন্দ্যা একবার, একাকী পুকুরঘাটের দিকে যাইতেছিল বলিয়া ঘরের মধ্যে রুদ্ধ হইল। খাঁচার মধ্যে যে একটুখানি আলো বাতাস আসিতেছিল, তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। এখন শুধু ঘরের মধ্যে অন্ধকার! আর অন্ধকারকেই ঘেরিয়া উঁচু উঁচু ইটের দেওয়াল!—তাহা এত শক্ত যে, হাজার ধাক্কা দিলেও একটু কাঁপিয়া উঠে না। মুক্তির আর কোন উপায় নাই।—অথচ অনিন্দ্যাকে মুক্ত হইতেই হইবে। একবার অন্ধভাবে ঘরের মধ্যটা দিয়া ঘুরিয়া

আসিল, কিছুই পাইল না। জুটা তুলা বাহির করা ছেঁড়া বালিশ পড়িয়া ছিল তাহারই উপর হাত ঠেকিল। একটা মুষিক'ও লাফাইতে লাফাইতে পলাইয়া গেল। অনিন্দ্যার মনে হইতে লাগিল যেন ঘরটায় আগুন লাগাইয়া, সেও এই আগুনে পুড়িয়া মরে—কিন্তু হাতের কাছে একটা দেশলাইয়ের বাক্সও পাইল না। তখন কান্না—আর কান্না—এই কন্নাটুকু না থাকিলে বোধ হয় ফাটিয়া মরিয়া যাইত।

রাত্রি যখন প্রায় দশটা তখন তাহার কারাগৃহের দরজা খুলিয়া গেল। অনিন্দ্যার জা রমা খানিকটা দুধ আর খানকয়েক লুচি আনিয়া কহিল, "খাও, খেয়ে ফুল-শয্যায় চলো, জানো আজ তোমার ফুলশয্যা!"

অনিন্দ্যা একবার রমার মুখের দিকে, চাহিল। যেন খুঁজিয়া দেখিতে চাহিল কালো মেয়ের লাঞ্ছনায় সেও একটু সহানুভূতির অশ্রু বহিয়া আনিয়াছে কি না—হায়রে কালো রূপ!—তাহারও চক্ষে একবিন্দু অশ্রু কোথায়? অনিন্দ্যা তাহার কম্পিত প্রায় ওষ্ঠ চাপিয়া কহিল, "আমায় তোমরা একটু বাইরেও ঠাঁই দেবে না? আমি যে আর সইতে পাচ্ছি না গো!"

রমা সহানুভূতির স্বরে কহিল ঠাঁই পাবে বৈ কি ভাই, সোজা রীতিতে চলো, তুমিই আবার এই ঘরের লক্ষ্মী হবে।

অনিন্দ্যা দেখিল এও সেই বাঁধি বুলিই বলে, অনিন্দ্যার হৃদয়ের খবর জানিয়া ত কেহ উত্তর দেয় না। তাহার বাবার জন্য তাহার বুক যে ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, দুধের বাটিটা ঠেলিয়া দিয়া সেইখানেই অঞ্চল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। রমা কহিল, তোর কপালে অনেক দুর্গতি আছে, আমি কি করবো বল্।—রমা চলিয়া যাইতেছিল কি ভাবিয়া হঠাৎ অনিন্দ্যা উঠিয়া পড়িয়া কহিল, তোমরা দুটো খেতেও দেবেনা?—বলিয়া লুচির ডিস্‌টা ধরিয়া ফেলিল।

রমা কহিল, খা না ভাই! আমি ত তোর জন্যই এনে ছিলুম।

অনিন্দ্যা লুচি কয়েকখানা খাইয়া, দুধবাটীটাও চুমুক দিয়া খাইয়া ফেলিল, কহিল মাগো—এত পাতলা দুধও এরা খায়।

রমা কহিল তোমার কর্ত্তাটিকে বলো, পুরু দুধ রোজ করে এনে দেবেন!

অনিন্দ্যা কহিল, আচ্ছা।

রমার যেন প্রহেলিকা ঠেকিতে লাগিল। এ বয়সের মেয়ের মুখে যে রকম কথা মানানো উচিত, অনিন্দ্যা ত তাহাও বলিতেছে না অথচ মাঝে মাঝে এমন বাঁকিয়া

দাঁড়াইতেছে কেন? লজ্জা সরমও কি একটু নাই? এ কি উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি?

ফুলশয্যার ঘরে যখন ডাকিয়া লইয়া গেল, তখনও কোন কথাটি কহিল না, একেবারেই গিয়া বিছানাতে শুইয়া পড়িল। ফুলের মালাটা শুধু খুলিয়া রাখিল। রমা উপদেশ দিতে লাগিল, অনিন্দ্যা একটা কথাও কাণে করিল কি না সন্দেহ।

বাহির হইতে কর্ত্রী কাত্যায়নী কহিতে লাগিলেন, দেখেছিস বড় বৌ ও ঢেটি মেয়েটার ষোলআনা বজ্জাতি, নইলে ফুলশয্যার বিছানায় যে শুতে হয়, তাতো বেশ জানা আছে!

রমা কহিল হাঁ এখন তোমারই ছেলেটিকে পেলে হয় বাছা।

কাত্যায়নী কহিলেন, আমার ছেলে ত ওর বিছানায় যাবেই না। যাবে ঐ একবার নিয়ম রক্ষা করতে—ঘরের মধ্যে, ওর সঙ্গে কথাই কি আমি কইতে দেবো? বারীন! বারীন!

বারীন একবার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই ফুলের মালাটা বিছানার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। রমা ডাকিয়া কহিল, ঠাকুর পো একবার দেখেই যাও

কালো বলেই পায়ে ঠেলো না। আর এম্‌নিই বা কি কালো এখানেও ভালবাসা পাবে।

বারীন মোটেই শুনিল না। তাহার চটিজুতার আওজটা কয়েকবার ফট্‌ফট্‌ করিয়া একেবারে উঠান ঘুরিয়া, তারপর বাহিরের দিকে মিলাইয়া গেল।

রমা কহিল, অনিন্দ্যা ঘরে একলা থাক্‌তে পার্‌বে ত?

অনিন্দ্য কহিল পারিব।

রমা কহিল কবাট বন্ধ করে যাই?

অনিন্দ্য কহিল, পায়ে পড়ি তোমাদের ঐ টুকু করলে দম আটকে মরে যাবো, আমার ছেলে বেলা হতে এরকম বন্ধ করা ঘর সয়না!—

রমা কহিল আচ্ছা কাজ নাই আমি পাশের ঘরেই রইলুম, কিছু দরকার হয় ডাক দিলেই আমাকে পাবে।

অনিন্দ্যা কহিল আচ্ছা।—

রমা তাহার স্বামী উপীনকে কহিল, দেখ, মা যতটা বল্‌ছেন ততটা ত মেজো বৌকে বোধ হচ্চে না—রং একটু কালো তা তো দেখে শুনেই করেছ। আর টাকাও নিয়েছ, একবারেই এতটা ধর্‌ ধর্‌ মার্‌ মার্‌ করাটা ভাল হয়নি, ছেলে মানুষ ঘাবড়ে গেছে।

উপীন কহিল মেয়ে মানুষের দস্তুরই ঐ, বিয়ের পর

প্রথম শ্বশুর বাড়িটা তাদের যমের বাড়ী ব'লেই মনে হয়। মা বাপ ভাই ভগ্নী সবাইকে ছেড়ে আসতে হয় কিনা—

অনেক রাত্রে তন্দ্রাভঙ্গে অনিন্দ্যা জানালাটার দিকে চাহিয়াছে, তাহার চোখের সামনে সহসা একটা উজ্জল তারা, গাছের ফাঁকের আড়াল দিয়া জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতে লাগিল। এমন দীপ্তি যেন তারার আলোয় সে কখনও দেখে নাই। ধক করিয়া মনে হইল যেন তাহার মা ঐখান হইতে হাত বাড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছেন। মেয়ের লাঞ্ছনায় ও তারালোকেও তাঁহার ঘুম হয় নাই, তাই মেয়ের দুঃখে ধরার দিকে নামিয়া আসিতেছেন।

তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া ডাকিল মা—কোথা হইতে উত্তর আসিল, যেন আয়!—আয়—অনিন্দ্যাও ত তাহাই চায়, তাহার একটা আশ্রয় চাই-ই। বাবা না লইতে আসে, তবু তাহাকে বাপের ঘরেই যাইতে হইবে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে দুয়ারগুলা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।—আকাশের দশমীর চন্দ্র উদয় হইতেছিল। আর সে তারাটাও ঠিক মাথার উপর জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল—আশে পাশের গাছ পালায়া নিঝুতি, প্রাচীর পার্শ্বের

কলাগাছের একটা পাতাও কম্পিত হয় নাই।—নিদ্রিত অজগরের মত পথটা ধূ-ধূ করিতেছে।

অনিন্দ্যার মনের সব বন্ধনগুলা যেন টুটিয়া গেল। তাহার ভিতর হইতে কে যেন বলিল। অনিন্দ্যা ঐ-ত তোর জগত, ঐ পথেই ত তোকে চলতে হবে, বেড়িয়ে পর্।—

অনিন্দ্যা আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিল না। নিশিথিনীর অঙ্ক বাহিয়া নিশিথিনীরই একটি তরঙ্গের মত অনিন্দ্যা অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার পায়ের যে একজোড়া তোড়া ছিল সেটা বিছানায় ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল।

গহনা তাহার গা হইতে শাশুড়ী খুলিয়া লইয়া রাখিয়াছিল, সেই জন্য কোন কিছুরই ভাবনা তাহার ছিল না। খালি পথ...আর পথ...। এপথের শেষই বা কোথায় আরম্ভই বা কোথায়? তাহা কে জানে? অনিন্দ্যা জানে পথে বাহির হইয়া পড়িলে এক জায়গায় না এক জায়গায় চলার শেষ আছেই—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভোর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গার পর রমা ভাবিল, দেখিয়া আসি—নববধূ কি করিতেছে। সে ঘুমাইয়া আছে কি বসিয়া আছে দেখা যাইবে।

উঠিয়াই দেখিল। ঘরের দোর খোলা। সে ইচ্ছা করিয়াই ঘরের দোর খুলিয়া রাখিয়াছিল, ভাবিয়াছিল যদি রাত্রে তাহার ঠাকুরপো আসিয়া শয্যায় আশ্রয় নেয়। তবে দরদালানের দুয়ার সে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল যদিও, কিন্তু একবারে খিল আঁটিয়া দেয় নাই, দেখিল, দরদালানও হাঁ হাঁ করিতেছে—এবং অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে কয়েকটা ছিন্নদল গোলাপ পৈঠায় ছড়ান রহিয়াছে, দেখিতে পাইল।

রমা আলো জ্বালিয়া ঘরে আসিয়া ডাকিল, নতুনবৌ বিছানায় হাত দিয়া ডাকিল,নতুন বৌ—কিন্তু কোথায় নতুন বৌ, শয্যায় ছিন্ন হার গড়াগড়ি যাইতেছে, ছোট ছোট ফুলের তোড়াগুলিও এলাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শুধু যখন সে শয্যা হইতে নামিয়াছে,তখন কয়েকটা গোলাপ তহাদের ব্যথা ভরা হৃদয়ের গোপন আর্ত্তনাদের মত, গৃহ প্রাঙ্গনে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে।

রমা তাড়াতাড়ি তাহার স্বামীকে ডাকিয়া কহিল

ওগো ওঠো—নতুন বৌকে যে ঘরে দেখতে পাই না ঠাকুরপো ত এসে কোথাও ডেকে নিয়ে গেল না ?

ছ্যাঁৎ করিয়া ঘুমটা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় উপীন, উঠিয়াই কহিল বল কি ? শয্যা ও গৃহের সর্ব্বাংশ খুজিয়া দেখিল যখন রমার কথাই সর্ব্বাংশে সত্য, তখন উপেন তাহার মাকে ও অন্যান্য জনকে ডাকিয়া দিয়া বাহিরে বারীণ যেখানে শয়ন করে সেখানে গেল। বারীণ ঘুমাইয়া ছিল উঠিয়া সবটা শুনিয়া একবারে যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে এই ভাবে চমকিয়া উঠিয়া—কহিল, আমি সে "অন্ধকারের" বিন্দু বিসর্গ জানি না !

উপেন্দ্র দেখিল সর্ব্বনাশ ! মায়ের কাছে ছুটিয়া আসিয়া কহিল মা তুমিই এই সর্ব্বনাশের গোরা, এসে অবধি একদণ্ড তাকে হাঁপ ফেলতে অবসর দাওনি। নিশ্চয় ধিৎকারে সে জলে ডুবে মরেছে। এখন খোঁজো, কোথায় ডুবলো।

কাত্যায়নী ভয়ে এতটুকু হইয়া জড়সড় ভাবে কহিলেন, তোমরা ত সবাই শুনেছ বাছা, আমি সে মেয়েকে কি এমন বলেছি। আর অমন ধারা কোন্ শাশুড়ীই বা না বলে থাকে, ভয়ে চীৎকারও করিতে পারিতেছিলেন না, ও নিজের দোষটাকেও স্বীকার করিয়া লইতে পারিতে

ছিলেন না ; নিজেই খিড়কীর ঘাটটা ওকিছু দূর অবধি জল পর্য্যন্ত খুঁজিয়া আসিয়া রমাকে কহিলেন, হাঁ বউ উপীনকে জিজ্ঞেসা করো দেখি—কলেরা হয়েছে বলে...

কর্ত্তা ধমক দিয়া কহিলেন একটা পাপ হয়েছে তাই মাথা পেতে স্বীকার করে নাও। আবার তার উপরে মিথ্যার ভার চাপাবে ?

কাত্যায়নী কপাল চাপড়াইয়া কহিতে লাগিলেন, "ওগো আমি জানি যে, আমার কপাল মন্দ, নইলে এমনই বা হবে কেন ? আর তুমি সর্ব্বনেশে লোকটি নইলে এগ্রহ ঘটবেই বা কেন ? দেশ জুড়ে দেনা করেছ এখন ছেলে বেচে দেনা উসুল করবার মতলবে আছো !

কর্ত্তা একটা তীব্র কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, লোক "পাঠাও। আর মায়া কান্না কেঁদে লোকজড় করতে হবে না, পুষ্পগ্রামের দিকে লোক পাঠাতেই হচ্ছে, উপেন্দ্র নিজেই পুষ্পগ্রামের দিকে যাত্রা করিল। প্রভাত হইতেই চারিদিকে ঢি ঢি পড়িয়া গেল,এবং আড়ালে আবডালে কাত্যায়নীকেই ইহার জন্ত দায়ী করিতে প্রতি-বেশিনীরা মোটেই ইতস্ততঃ করিল না। কাত্যায়নী কেবলই ঘর বাহির করিতে লাগিলেন। ঐ রুক্তি মেয়ে যে তাঁহার এতটা দায়ের কারণ, তাহা যেন এতক্ষণে হুঁস

হইল। ঘরে হাঁড়ী আর চাপে না। সকলে হায় হায় করিতেছে, এমন সময় গোষ্ঠবিহারী আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া কাত্যায়নীর পা দুটা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল। দোহাই বেহান, আমার অবুঝ মেয়ে, আপনারা বুঝি একটু বকেছেন তাই রাত্রের বেলায় একলাই চলে গেছে।

কাত্যায়নী মাথার ঘোমটাটি খুব জবর করিয়া টানিয়া দিয়া ঘরে আসিয়া গর্জ্জিতে লাগিলেন, পুচ্ছবিমর্দ্দিত সর্পিণীর গর্জ্জনও যেন তত ভয়াবহ নহে।

তার পর হাড় জ্বালানী নতুন বৌএর গুণ ব্যাখ্যা।—কাত্যায়নী জনে জনে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন—তোমরা যে এতক্ষণ আমার দোষ দিচ্ছিলে এইবার দেখ, সে মেয়ের বুকের পাটা কতদূর? তাকে পায়ের নথ হতে মাথার চুল পর্য্যন্ত আগাগোড়া না আঘাত্‌লে সে মেয়ে কি কখনও বশ হবে, মনে করেছ?

প্রতিবেশিনীরা মুখে কাপড় দিয়া কহিল, "তাও সত্যি বাছা এমন দস্যি বউ তোমাদের এবাড়ীতে কেন,এ পরশেই আসে নাই।

কাত্যায়নী জনান্তিকে গোষ্ঠবিহারীকে কহিয়া দিলেন, তোমাদের সোণার চাঁদ মেয়েকে ঘরেই রাখিয়া দাও।

ও মেয়েতে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা আবার ছেলের বিবাহ দিয়া দিব।

গোষ্ঠ বলিয়া পাঠাইল। "কুসন্তান যদি বা হয় কুমাতা কখনও নয়।" দোষও ত ক্ষমা করতে হয়।

ঘরের ভিতর হইতে তীব্রকণ্ঠে উত্তর আসিল না-না-না! গোষ্ঠ ভাবিতে ভাবিতে ঘরে চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বারীনেরও গঞ্জনার সীমা নাই, ছেলের দল পর্য্যন্ত তাহাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন পুরুষ, একটা বউ বশ করিবার সে সাধ্য নাই। একবারে পলাইয়া গেল!

হায়রে বউ—তুইত শুধু একলাই পলাইলি না। বারীন-কেও শুদ্ধ যে পলাইতে হইবে। ছুটি ফুরাইবার পূর্ব্বেই বারীন আপনার কর্ম্মস্থান কলিকাতায় চলিয়া আসিল।

কলিকাতায় আসিয়া অনেকটা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তবু তাহার সন্দেহ হইতে লাগিল, এখানকার বাতাসে পর্য্যন্ত যেন একটা ধিক্কার মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে—এ ধিক্কার ক তাহারই প্রাপ্য?

বড় রাগ হইতে লাগিল। বন্ধুবান্ধবেরা যখন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল কি হে, শুভকার্য্য সব সমাধা হয়ে গেল, তখন বারীন নানারকম মিথ্যা গল্প ফাঁদিয়া তাহার বিবাহ-ভঙ্গের একটা কৌতুককাহিনী বলিয়া গেল।

বন্ধুরা কহিল আবার বিবাহ করো।

বারীন কহিল রাজী আছি যদি তেমন সৎ মেয়ে পাই।

বন্ধুরা কহিল,মেয়ের অভাব কি, হাজার মেয়ে গড়াগড়ি যাইতেছে।

বারীন কহিল আমার মায়েরও হুকুম, বিবাহ করিতেই হবে।

সুযোগ বুঝিয়া বারীনের বন্ধু রাইচরণ, বারীনের সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিল। রাইচরণ কহিতে লাগিল তাহার প্রতিবেশির এক :পরমাসুন্দরী কন্যা আছে, দেখিয়া আসিতে হইবে।

ঘটা করিয়া এক রবিবারে কন্যাও দেখিয়া আসা হইল। মেয়ে তাহার পছন্দ হইল। এবার আর কালো মেয়ে নহে। গায়ের রং যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে।

এ মেয়ের নামটিও মোহিনী, বারীন তাহার বন্ধুকে কহিল প্রথম যে জাল মেয়েটিকে আমাদের দেখাইয়াছিল ;

তাহারও নামছিল মোহিনী, বন্ধু রাজশেখর সে কথার সমর্থন করিল।

বারীন কহিল তাহার মাকে পত্র লিখিয়া মত জানিয়া উত্তর দিবে। সপ্তাহের মধ্যে মত আসিয়া গেল, মা লিখিয়াছেন তুমি একেবারে দিন স্থির করিয়া ফেল।

কিন্তু মধ্যে এক বাধা জুটিয়া গেল, কর্ত্তা হরকুমার, কহিতে লাগিলেন, সে হইবে না আর একবার কালো মেয়েকে আনিয়া দেখা যাউক, তার পরেও যদি গলায় অন্য ব্যবস্থা হইবে।

বলিতে কহিতে একবৎসর কাটিয়া গেল। এদিকে একবৎসরের মধ্যেও যখন শোনা গেল, অনিন্দ্যার মোটেই পরিবর্ত্তন হয় নাই, তখন কাত্যায়নী তাঁহার কালো বউকে আনিবার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিলেন না। আসল কথা যে টাকা তিনি পাইয়াছিলেন, সে টাকায় তাঁহার মন উঠে নাই, আরও দক্ষিণা চাহিতেছিলেন ও দানসামগ্রী আরও বেশী রকম পাইবার আশা করিতেছিলেন।

গোষ্ঠবিহারী যখন জানাইল আর কিছু দেওয়া ত দূরের কথা, উপরন্তু দেনায় আকণ্ঠ ডুবিয়া গিয়াছে,তখন কাত্যায়নী মনে মনে যে পন্থা ঠিক করিয়াছিলেন, সেই পন্থাতেই লাগিয়া

গেলেন। বারীনকে পত্র লিখিলেন একেবারেই বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেল।

বারীন পত্রোত্তরে জানাইল বিবাহ সেখানে হইবে বটে, কিন্তু কন্যার ঠিক আপনার বলিতে কেহ নাই, এক কাকা আছেন তিনি কোন গতিকে, অল্প স্বল্প টাকায় দায় উদ্ধার করিতে পারিলেই বাঁচেন। পয়সা কড়ি আশানুরূপ মিলিবে না।

কাত্যায়নী লিখিলেন, পয়সা কড়ি ত খুব ভোগ করিয়া দেখিয়াছি, এখন আমার রূপ চাই। রূপ নহিলে আমার ঘর মানাইবে না।

উপেন্দ্র কহিল মা পাগল হইয়াছেন। মা জানাইলেন, মা ত পাগল হয় নাই—মাঁ বিষের জ্বালায় জর্জ্জরীভূত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে এ মনের কাঁটা তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

আয়োজন চলিতে লাগিল। এবার কর্ত্তাকেও ছাপাইয়া, —একদিন কালীঘাট যাইবার নাম করিয়া, কাত্যায়নী কলিকাতা চলিয়া গেলেন। এবং সেখান হইতে গোষ্ঠবিহারীকে পত্র লিখিলেন। "আমার পুত্রের আবার বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে, পারো যদি, হাজার টাকা লইয়া আইস, নহিলে বিবাহের কথা একবারেই পাকা, এবং সেই সঙ্গে কন্যারও চিরবৈধব্য অবধারিত!—"

কাত্যায়নী ভাবিয়াছিলেন এই রকম কড়া কথা লিখিয়া দিলে, গোষ্ঠ টাকা আনিতে পথ পাইবে না। তখন আর যায় কোথায়—বিবাহ হইতেছিল দুদিন আগে, না হয় দুদিন পরেই হইবে। অথচ ফাঁকতালে কিছু টাকাও আদায় হইয়া যাইবে।

কাত্যায়নী মতলবটা আঁটিয়াছিলেন ঠিক, কিন্তু, কোথায় কালো মেয়ের বাপ্? এযে একখানা চিঠি দিয়াও কোন খোঁজ খবর লয় না…তবে কি তাহাই মত যে তাহাদের জামাইএর পুনর্ব্বার বিবাহ হইয়া যাউক?

বারীন কহিল, তাহাই মত মা, দেখিতেছ না একখানা পত্র দিয়াও খোঁজ লওয়া নাই।

রাইচরণ আসিয়া কহিল, আর গড়িমাসিতে দরকার কি? একবারেই দিন পাকা করিয়া দাও, পরশু ভাল দিন আছে ঐ দিনেই শুভকার্য্য সমাধা হইয়া যাইবে।

বারীনও তাহাই চায় গত বৎসরের বিবাহ দিনের স্মৃতিটা বড় প্রবলভাবে তাহাকে দোলাইয়া যাইতেছিল। বারীনের মনে হইতেছিল, আর একটা বিবাহ ব্যতীত তাহার এ লজ্জার কাঁটা উন্মূলীত হইয়া যাইবে না!

বিবাহ হইল বটে কিন্তু তত ধূমধামের সহিত নহে।

নবম পরিচ্ছেদ।

সংসারের কায লইয়াই গোষ্ঠবিহারী মাতিয়া ছিল। মেয়ের বিবাহের সময় যে দেনাটা হইয়াছিল; তাহার ইচ্ছা ছিল, এই বৎসরকার চাষের ফশলে সেটার কতকটা শোধ করিয়া ফেলিবে। সেই জন্য গোষ্ঠর দিন রাত্রি জ্ঞান ছিল না। হৈ হৈ করিয়া মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিল। জামাই বারীনবাবু যে আবার বিবাহ করিতে উন্মত্ত হইয়াছেন স্বপ্নেও তাহার সে কথা মনে আইসে নাই।

অথচ অতি অসম্ভবও একদিন সত্য হইয়া দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা দেখায়, যখন এই রকম বাস্তবের লৌহচক্র তলে জীবনটা নিষ্পেষিত হইতে থাকে!

গোষ্ঠ মাঠের কার্য্য ফেলিয়া সূর্য্যকে ডাকাইয়া পত্রখানা দেখাইল।

সূর্য্য কহিল, ব্যাপার কিহে মেয়ের দোষ নাই, ঘাট নাই, ওমনি ছেলের একবারে বিবাহের দিন স্থির। বিবাহের সময় ছোট মেয়ে ভয়ে একটা কি কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারই জন্য এই শাস্তি, শাক চুরিতে ফাঁসির হুকুম?

গোষ্ঠ কহিল, আমার বরাতে সুখ নাই ভাই, তুমি আমি

তার কি করবো। নইলে মেয়েরই বা ওরকম মতলব হবে কেন ?

গোষ্ঠ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সূর্য্যকান্ত কহিল সে হইবে না। একবার দেখিতে হইবে। একরকম টানিয়া হেঁচড়াইয়া সূর্য্যকান্তই, গোষ্ঠবিহারীকে বারুইপুর লইয়া গেল।

সেখানে সংবাদ শুনিয়া কর্ত্তারও চক্ষু স্থির। কর্ত্তা কহিলেন কই আমি ত এর বিন্দু—বিসর্গও জানিনে! পত্র-খানার তারিখ দেখিয়া কহিলেন, এযে দেখছি অনেকদিন কারই পত্র। আপনারা এতদিন পরে পত্র পেয়েছেন ?

গোষ্ঠবিহারী কহিল। গ্রহ যখন ঘটে তখন এম্‌নি করিয়াই ঘটে এই পত্র এ'লো কিনা চিঠি আসবার নির্দ্দিষ্ট দিনের সাত দিন পরে—

কর্ত্তা কহিলেন, চলুন। এবার আমাকেও যাইতে হইতেছে। দেখা যাউক খুব সম্ভব এখনও বিবাহ হইয়া যায় নাই।

গোষ্ঠ কহিল, না বেহাই মশাই, আমার মন ব'লছে বিবাহ হয়ে গেছে এ মিথ্যা হতে পারে না!

সেই দিনই তিনজনে কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন

এদিকে আল্‌চা আল্‌চা কথাটাও পুষ্প গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল।

পাড়ায় স্ত্রীমহল অনিন্দ্যাকে বলিতেছিল,অনিন্দ্যা তোর স্বামী যে আবার বিয়ে করতে চাইছে। তু যেয়ে একবার হাতে পায়ে ধরে দেখগে না।

অনিন্দ্য হাত ঘুরাইয়া কহিল, মরণ। বিয়ে করলো তা আমার কি।

প্রতিবেশীরা কহিল, আমার কি তখন বুঝবি, যখন এখানেও ঠাঁই পাবি না ওখানেও না। আজ হাস,খেল, গান গা, হায় হায় তোর মা, এমন অলক্ষণা মেয়েই রেখে গিয়েছিল। তেমন জামাই···শুনচি কেবল তোরই জন্য আবার বিয়ে করতে বসেছে!

অনিন্দ্যা একবার দাঁড়াইয়া কথাটা শুনিল, তারপর চলিয়া গেল কোন উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিল না।

বাড়ীর মধ্যেও যখন প্রবেশ করিল, তখন বাড়ীর খুড়ি, জেঠি, ভাই সকলে তাহার উপর খড়্গ হস্ত হইয়া উঠিল, সকলেই একবাক্যে কহিল এমন মেয়েও তুই ভূভারতে এসেছিলি। তুই গলায় দড়ি দিয়ে মরতে পারতিস্‌নে— ?

অনিন্দ্যার চক্ষু দিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া গোষ্ঠ যাহা আশা করিয়াছিল দেখা গেল সত্যই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বারীনেরও একটু বাধে নাই, বারীনের মায়েরও একটু বাধে নাই।

কর্ত্তা যখন তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া দুকথা গৃহিনী কাত্যায়নীকে শোনাইলেন, তখন কাত্যায়নী তীব্র ঝাঁঝের সুরে কহিলেন। হ'লো যেন বিবাহই হয়ে গেছে, তবু এতটা দোষের কি হয়েছে শুনি। তোমারই পিতামহর ক'টা বিবাহ ছিল মনে আছে? পুরুষ মানুষ যটা খুসি বিবাহ করবে। এ বউকেও পছন্দ না হয় আরও করবে। তাই বলে জুটে পুটে যে এসেছো সাতপাক ফিরিয়ে দেবে না কি—আর ঐ মিন্সেটিও যে এসেছেন কেন চিঠি পেয়ে আসতে পারেন নি?—টাকাই বড়···এখন থাকুন টাকা বুকে দিয়ে···কালো মেয়েকে আমাদের মত ঘরে দিতে দুহাজার একহাজারে কিছু হয় না। আরও বেশী কিছু দিতে হয়। আর দানসামগ্রী গুলাও—

কথার শেষ দিকটাতে খুব একটা জোর দিয়া গেলেন বাহিরে গোষ্ঠ, সূর্য্যকান্ত অপেক্ষা করিতেছিল, কথাগুলা পরিষ্কারই তাহাদের কর্ণে গেল।

সূর্য্যকান্ত কহিল ওহে বন্ধু আর নয়—বেরিয়ে পড়।

এরা রাক্ষসের দল—পয়সার জন্য না করতে পারে জগতে এমন অসাধ্য এদের কিছুই নাই।

গোষ্ঠ অভিভূতের মত বসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার আর ভাবনা করিবার ও কিছু সাধ্যে কুলাইতেছিল না। এই বড় মানুষের ঘরে মেয়েটিকে দিবে বলিয়া সে কি চেষ্টাই না করিয়াছিল, তাহার যথা সর্ব্বস্ব নোটের তাড়ায় মুড়িয়া, এই বড়লোকের বাড়ীতে আনিয়া হাজির করিয়াছিল। সর্ব্বস্ব খোয়ানর পরিনাম এই হইল? হায়রে অদৃষ্ট।......

তাহার কানের কাছে কলিকাতা নগরীর এই জন কোলাহল,যেন উন্মত্ত এক তাণ্ডবের মত শুনাইতে লাগিল। রক্তপিপাসীর দল খড়্গ হাতে করিয়া ছুটিয়াছে, আর পেছন পেছন বদ্ধ হস্ত তাহার কন্যা, অনিন্দ্যা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছে। কোথায় কোন্ বেদীমূলে তাহার বলি হইবে, কে জানে,তাহাকে রক্ষা করিতেও কেহ নাই!......

এই দিবাস্বপ্নে গোষ্ঠবিহারী একবারে যেন উন্মাদ হইয়া গেল। ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাত্যায়নীর পায়ের কাছে পড়িয়া মাথা কুটিয়া কহিতে লাগিল। হে রাক্ষসী, হে দেবী, আমার মেয়ের বুকের রক্তে কতটুকু তোমার পিপাসার নিবৃত্ত হইবে? তাহাকে ত বলি দিলে

—এ বাপের হৃদয় খানির দিকে ত চাইলে না। এ যে ভেঙ্গে পিষে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, তারপর উঠিয়া বাহিরে আসিল, বাড়ীটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল। আমি অন্য অভিশাপও তোমাদের দেব না। যেমনি বিনা দোষে আমার কন্যার সর্ব্বনাশ করলে, তেমনি এই বাপের বুকের ব্যাথা একদিনও যেন ভোগ করো। যেন আমার এই দীর্ঘশ্বাসের বেদনায় তোমাদের গৃহে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। যেন তোমাদের সব ঐশ্বর্য্য আমার মেয়ের সৌভাগ্যের সঙ্গে, গলে খসে ধূলি হয়ে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। যদি ঈশ্বর থাকেন তবে আমার এ অভিশাপ মিথ্যা হবে না।

সূর্য্যকান্ত, পাগল বিহারীকে ধরিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া লইয়া আসিল।

কর্ত্তা কাত্যায়নীকে কহিলেন, শুন্‌লে ত গিন্নী এ অভিশাপের একটা বর্ণও মিথ্যা হবে না। তোমার প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির বহরে, আর এই সুখলোলুপ পুত্রের ব্যবহারে; সংসারে বিষের বাতি জ্বলে যাবে।

বারীন ও তাহার মাতা দুই জনেই মস্তক অবনত করিয়া রহিল। কাত্যায়নী মুখ তুলিতে তুলিতে আর তুলিতে পারিলেন না, কেমন যেন হঠাৎ একটা ভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ ।

এতদিন পরে অনিন্দ্যার একি হইল ? তাহার বুকের ভিতর হইতে যে একটা কান্না বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে, একান্নাটা এতদিন তাহার কোথায় ছিল ? কোন্ মগ্ন আঁধারের গভীর অতলতায়—?

জন্মিয়া অবধি সে অনেকদিন অনেকবার কাঁদিয়াছে বটে, কিন্তু এমন ধারা নয়—এযে তাহার বুকের ভিতরটা আলোড়িত হইয়া যাইতেছে। সমুদ্র মন্থনের মত ? চেষ্টা করিয়াও এ কান্নার প্রতিরোধ ত ঘটিয়া উঠিতেছে না। এ যেন বহুদিন একটা উৎসের মুখ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ পাথরখানা সরিয়া গিয়াছে। এখন শুধু কান্না—আর কান্না!

কাঁদাও দেবতা, এই অশ্রু ধারায় তাহার ভিতরের অনেকখানি গ্লানিই ধুইয়া মুছিয়া যাইতেছে!

লোকে বলিতেছে, তাহার স্বামীর আবার বিবাহ—হইলেই বা, সে ত স্বামীকে চাহে নাই, স্বামী তাহার একটা দুইটা, দশটা বিবাহ করিয়া আসিলেও কোন কালে সে ত একবার ভ্রুক্ষেপও করিত না। সে যে অসঙ্কোচে আপনার অধিকার—আঁধারের বুকের উপর ছড়াইয়া আসিয়াছিল। তবে আবার আজ কিসের বাঁধন ? স্বামী হইতে যতদূর সে

চাহিয়াছিল, ততদূরই তাহার মিলিয়াছিল, তবে দূর আজ নিকট হইয়া আসিতেছে কেমন করিয়া ? জাগাও জাগাও ! যাদুকর ! আজ তোমার যাদু দণ্ডে একটা সুপ্ত পাষাণের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

এ জাগরণে একটা মোহ আছে, সে মোহ এই, অন্ধকারের পরপারে আলোর জগৎ যে কত সুন্দর তাহাই বুঝাইয়া দিবার জন্য—

কিন্তু বড় অসময়ে জাগিল অনিন্দ্যা,যখন তাহার দেবতা বিমুখ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। তখন আসিল পূজার অর্ঘ্য লইয়া—

অনিন্দ্যার সই আসিয়া ডাকিল অনিন্দ্যা। অনিন্দ্যা তত বেলা পর্য্যন্ত বিছানায় পড়িয়াছিল। উঠে নাই।

সই কহিল, হাঁ সই তোমার কি কোন অসুখ করেছে ? অনিন্দ্যা ভিতর হইতে ধরাকণ্ঠে কহিল, হাঁ ভাই অসুখই করেছে—

সই কহিল কবাটটা খোল্ না ভাই কথা আছে।

অনিন্দ্যা ভাবিল কোন সংবাদ আছে—তাড়াতাড়ি কবাটটা খুলিয়া ফেলিল—মাথার চুলগুলি তখনও তাহার উস্কো খুস্কো—চক্ষের কোনে অশ্রুও তখন লাগিয়া ছিল।

সই, অনিন্দ্যার পানে চাহিয়া কহিল। এই যে সই তুমি কাঁদ্‌ছিলে।

অনিন্দ্যা মুখটা ফিরাইয়া কহিল মরণ…তখনও তাহার বোধকে বাহিরে প্রকাশ হইতে দিতে কি লজ্জা!

সই কহিল, তোমার বাবা ফিরে এসেছেন!

অনিন্দ্যা কহিল, না।

সই কহিল বড় দুঃখের কথা ভাই, তখন কারও কথা শুন্‌লি নে, এখন জন্ম ভোর কাঁদ্‌, পায়ে ধর্‌, দুয়ো হয়ে পড়ে থাক্‌।

অনিন্দ্যা তাহা শুনিতে চাহিল না।

কয়েকটা বাসন গেলাস লইয়া পুকুর ঘাটে ধুইতে গেল! যেদিন তাহার সুখ ছিল, সৌভাগ্য ছিল—বাপের আদরের দুলালী ছিল, তখন কেহই গায়ে পড়িয়া তাহার একটা সুসংবাদের কথা শুনাইতে আইসে নাই, আর আজ যেই দুঃখের দিন পড়িয়াছে, অমনি প্রত্যূষেই সই আসিয়া উঠাইতেছে, আত্মীয়তা করিয়া বলিতেছে ভাই ওঠো! তোমার কপাল পুড়িয়াছে।

অনিন্দ্যা বাসন ধুইয়া রাখিয়া কতকগুলা ক্ষারে সিদ্ধ কাপড় লইয়া নদীর ঘাটে কাচিতে গেল। বাড়ীতে তাহার আদৌ মন বসিতেছিল না। চারি দিক হইতে তাহাকেই

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কেবলি বলাবলি চলিতেছিল—ওগো কালো মেয়ে তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

কাপড় কাচিতেছে এমন সময় চাহিয়া দেখিল ঘাটে একখানা নৌকা আসিয়া লাগিল। নৌকায়, আরোহী আর কেহ নাই, তাহার পিতাই নৌকা হইতে নামিলেন। পিতার মুখ চক্ষু একি—এযে একবারে লাল হইয়া গিয়াছে, যেন কতদীর্ঘ দিন ঝর বাতাসের সঙ্গে যোঝা যুঝি করিয়া-আসিয়াছেন। মাথার চুল একবারে রুক্ষ, বিবর্ণ—

অনিন্দ্যা বাবা বলিয়া ডাকিতে যাইয়াও ডাকিতে পারিল না। ভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। বাবাও ত অনিন্দ্যা বলিয়া ডাকিলেন না। কেমন করিয়া একি হইয়া গেল?

নৌকাখানা ঘাটে সোয়ারী নামাইয়া দিয়া আবার বাঁকের পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিহারী অবোধ্য, বিজ্ বিজ্ ভাষায় কি বলিতে বলিতে অনিন্দ্যার দিকেই আসিতে লাগিল।

অনিন্দ্যা চাহিয়া দেখিল মাতালের পদদ্বয়ের মত তাহার পিতার পদযুগল টলিয়া পড়িতেছে।

অনিন্দ্যা কাপড় কাচা ফেলিয়া পিতাকে ধরিতে আসিল। বিহারী মত্ত স্বরে কহিল ছুঁস্নি সরে দাঁড়া-খানিক স্তব্ধ হইয়া অনিন্দ্যার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া

রহিল। তারপর অস্বাভাবিক কেমন এক হুঙ্কার ছাড়িয়া ঘাটে যে একটা বহুদিনের পরিত্যক্ত কলসী পড়িয়া ছিল সেইটা কুড়াইয়া বালুপূর্ণ করিতে লাগিল।

অনিন্দ্যা ব্যাকুল হইয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিল বাবা এমন কচ্চো কেন বাবা···কি হয়েছে তোমার···বলবে না? এযে মরার কলসী বাবা—ছুঁতে নাই। তুমি নৌকা হতে নেমেই এমন হয়ে গেলে কেন বাবা? কেউ কি কিছু তোমায় খাইয়েছে?

দুই হাত দিয়া পিতার মুখে হাত বুলাইতে লাগিল। বিহারী সবলে অনিন্দ্যার হাতটি সরাইয়া দিয়া সেই বালুপূর্ণ কলসীটাতে, নিজের চাদরখানার লম্বা দিকটা দিয়া বাঁধিতে লাগিল। তার পর দৃঢ় হস্তে অনিন্দ্যাকে ধরিয়া ফেলিয়া অনিন্দ্যার গলায় সেই বালুপূর্ণ কলসীটি, চাদর দিয়াই বাঁধিয়া দিতে লাগিল।

অনিন্দ্যা ভয়ে মূর্চ্ছা যাইবার মত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি পিতার কোলের উপর ছিল বলিয়া, মৃত্যুভয়টা একবারও মনে উদিত হয় নাই। তবু চীৎকার করিয়া উঠিল।

বিহারী কহিল, "কাঁদিস্‌নি, তোকে মুক্তি দিচ্চি—তুই আমার আদরের মেয়ে ছিলি কিনা—তাই তোর

কপাল ভেঙেছে দেখে, তোর বাবা…তোর বিসর্জ্জনের আয়োজন ক'রেছে।"

অনিন্দ্যা প্রাণপণ বলে তাহার বাবাকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, দোহাই বাবা! তুমি যা ব'লবে তাই শুনবো, যেখানে যেতে ব'লবে—সেইখানেই যাবো। আমায় মেরে ফেলো না—তোমার পায়ে পড়ি বাবা!

বিহারী তখন উন্মত্ত! কণ্ঠস্বরেও কেমন এক প্রবল মত্ততা জড়িত। কহিতে লাগিল, ভেবেছিস্ তোকে মারতে চাইছি, তোর বুকে বাজছে, আর আমার বুকে বাজছে না—তুই যে আমার সর্ব্বস্ব ছিলি অনিন্দ্য! আমার ছেলেদের চেয়ে…আমার আত্মার চেয়ে, যে তোকে ভাল-বাসতুম—সেইজন্য ভূমিষ্ঠ হবার পর একদিনও বুকে হ'তে নামাইনি। তুই আমার ব্রহ্মময়ি ছিলি। আজ বিসর্জ্জন! আমার ব্রহ্মময়ীর বিসর্জ্জন! আমার শ্যামা মায়ের বিসর্জ্জন! আমার কালো মেয়ের বিসর্জ্জন!

সবলে ছুড়িয়া দিতে যাইবে, এমন সময় নিজেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল!

অনিন্দ্যার চীৎকারে তখন কাছের চাষী বাসীর দল—ছুটিয়া আসিতেছিল।

অনিন্দ্যা গলার কলসীটা খুলিয়া ফেলিয়া বাবার পায়ের উপর হাত রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গ্রামেরও দু-পাঁচজন আসিয়া উপস্থিত হইল। সকাল বেলায় নদীর ঘাটে গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। কেহই কিন্তু বিহারীর ব্যাধির অবধারণ করিতে পারিল না!—

ডাক্তার আসিয়া কহিল আপোপ্লেক্সির ভাব। ভাল হইতেও পারে, না-ও পারে—মনের ভিতরে খুব একটা আঘাত লেগেছে, বাড়ী নিয়ে যাওয়া হউক।

সূর্য্যকান্ত সে আঘাতের সম্ভাবনাটাও জামাইয়ের পুনর্ব্বিবাহে ঘটিতে যে পারে তাহা বলিয়া গেল।

অনিন্দ্যাকে যে তাহার পিতা ডুবাইয়া দিতে গিয়াছিল —সে কথাটা অনিন্দ্যা কাহাকেও না জানাইয়া পিতার শয্যাতেই পড়িয়া রহিল। সে ভাবিল, পিতার মনে তাহাকে বিসর্জ্জন দিবার কল্পনা কখনও উদয় হইত না কেবল চোখের কাছে শূন্য কলসীটা পড়িয়াছিল দেখিয়া, নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া এইরকম করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মনে মনে শত ঠাকুর দেবতাকে অনিন্দ্যা ডাকিতে লাগিল, ঠাকুর আমার বাবার রোগ তোমরা ভাল করে দাও। এর পর হ'তে বাবা আমায় যা বলবেন, তাই শুনবো

শ্বশুরবাড়ী যেতে বলেন তাই যাবো, বনবাসে যেতে বলেন, -তাই যাবো।"

দেবতারা তাহার কথায় কর্ণপাত করিয়াছিল কি না কে জানে!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার পর, বারীনের আর ছোট একটা বাড়ীতে থাকা হইল না। নব পরিণীতাকে লইয়া আলাহিদা বাসা ভাড়া লইতে হইল। মধ্যে দিন কতক খুড়শ্বশুরের বাড়ীতেই পত্নীকে রাখিয়া আসা যাওয়া করিত। খুড়শ্বশুর মহাশয় স্পষ্টই একদিন কহিলেন। এ রকম নবাবী চাল আমাদের এখানে খাটিবে না। আলাহিদা বাসার বন্দোবস্ত দেখ। রাইচরণ কহিল, ওহে বেজায় ছোটলোক, এখন কাজ উদ্ধার হয়ে গেছে কি না! নববধূকে যে দেশের বাড়ীতে পাঠাইবে, সে পথও পিতা-ঠাকুর মহাশয় বন্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই জন্য বারীনও রাগ করিয়া বলিয়াছে, দেশের মুখ সে আর দেখিবে না।

বাসা বদলাবদলিতে প্রথম দিন কতক্ তাহার

একটু অসুবিধা ঠেকিয়াছিল। তার পর যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই যেন সে সৌভাগ্যের মুখ দেখিতে পাইল। লোকে কহিল। পয়মন্ত মেয়েটি। আপিসে যত মাহিনা পাইত, তাহার উপর আর বিশ টাকা বাড়িয়া গেল। এই সময়ে বিবাহের বৎসরদেড় অন্তে একটি কন্যারত্নও তাহার জন্মলাভ করিল।

বন্ধু রাজ শেখর কন্যা দেখিতে আসিয়া কহিল, এই কন্যাই তোমার পাতকের প্রায়শ্চিত্ত ক'রবে বন্ধু। যত্ন-করে' !... ...

বারীন কহিল, কি রকম ?......

রাজশেখর কহিল জানো না ? তোমার প্রথম পক্ষের শ্বশুরের মনস্তাপ ! ভেবেছো এতটা দীর্ঘশ্বাস ওমনি বিফলে যাবে ?...যিনি একরকম তোমারি ব্যবহারে উন্মাদ আর স্তম্ভিত হয়ে গেছেন।

বারীন কহিল, কেন আমার ব্যবহারের দোষটা কোথায় দেখলেন তিনি !—

রাজশেখর কহিল কোথায় দেখলেন ঠিক তা আমি বলতে পারিনে, কিন্তু তোমারি ব্যবহারে উন্মাদ হয়েছেন এটা বলতে পারি—

বারীন কহিল, হোক্ তার জন্য আমি দায়ী নই।

আমি জীবনে সুখ চাই, সৌভাগ্য চাই, রূপসী পত্নী চাই, পরের দুঃখ হবে ভেবে, আমি নিজের জীবনটাকে জ্বালাময় করে তুলতে পারি নে, তাঁর যেমনি কালো মেয়ে ছিল, তেমনি কালো পাত্রও ত পেতে পারতেন।

রাজশেখর কহিল, পারতেন ঠিক, কিন্তু টাকা গুলির কথা, ভেবে দেখা উচিত ছিল, তোমরা যে একদিকে কন্যা, আর একদিকে টাকা মেপে নিয়েছিলে।

বারীন কহিল, সেটা একটা মস্ত দমবাজী। মেয়ে ভাল না হলে কিছুতে রাজী হতাম না, লক্ষ টাকা দিলেও না!—

রাজশেখর কহিল এখন সুখী হয়েছো ত?

বারীন কহিল হাঁ!—

রাজশেখর চলিয়া গেল। বারীন রাজশেখরের এই হঠাৎ আগমনের কারণটা ভাল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না!—রাজশেখর তাহার নবজাত কন্যার দিকে লক্ষ করিয়া কেন একথা বলিয়া গেল? নিশ্চয় ঈর্ষান্বিত...তাহার সৌভাগ্য দেখিয়া ঈর্ষান্বিত ছাড়া আর কিছুই নয়। ডাকিল, মোহিনী।

মোহিনী ছেলে কোলে করিয়া ততক্ষণ ভিতরে দাঁড়াইয়া রাজশেখরের সকল কথাই শুনিয়াছিল, নাইবার জন্য

তৈলের বাটি ও গামছা আনিয়া দিয়া কহিল, রাজশেখর বাবু এসে ছিলেন না ?

বারীন কহিল হাঁ !

মোহিনী কহিল, দেশের সব সংবাদ ভাল।

বারীন কহিল হাঁ, কিন্তু দেখ ও ত সংবাদ দিতে আসা নয়···আমার সৌভাগ্যে ঈর্ষা করতে আসা, মাইনে বেরেছে শুনে, কারও সোয়াস্তি নেই !

মোহিনী কহিল নাই বটে, আমিও ঘরের ভিতর হতে সব শুন্লুম। কিন্তু আমার এই মেয়ের দিকে চেয়ে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে সে ত সৈতে পারব না।

বারীন কহিল, ঐজন্য ত আমার আরও আক্ষেপ হচ্চে, আমায় দশকথা বল্লে হয়ত সইতে পারতাম, কিন্তু এই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ কন্যা আমার···যে সংসারের বুকে ফুটে উঠেছে··· একটি শতদলের মত, ভগবান কার পাতকের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাকে পাঠিয়েছে কেউ বল্তে পারে ? ওরা তর্ক করে বলে ছেলে মেয়েকেও পিতার কর্ম্মফলের বোঝা বইতে হয়। আমি এম্নি কি দুষ্কর্ম্ম করে ফেলেছি যার জন্য আমার এই মেয়েটিকে—ওটা কিছু নয় বুঝেছ কালো বউএর বাপ্ থদ্দু হয়ে গেছে, তাই আমাকে দিয়ে সাজিয়ে, দেশের লোক একটা গল্প তৈরি করে

নিচ্ছে। তা নিক, গল্পের শেষ দিকটাতে আমি একবারে শূন্য।—

মোহিনী তাহার রাঙ্গা মেয়েটিকে স্তন্য পান করাইতে করাইতে মেয়ের মুখখানি মুছাইয়া দিতে দিতে কহিল। আমি জীবনে টাকা পয়সার কামনা করিনি, ধন দৌলতেরও বর মাগিনি, চেয়েছিনু, এই সন্তান…ভগবান তা আমায় দিয়েছেন। এই মেয়ের দিকে চেয়ে যে কেউ একটা কথা ব'লে যাবে সে আমার অসহ্য!—

বারীন কহিল, আমি বারণ করে দেব, আমি তাদের বলবো তোমরা আমায় যাই খুসি বলতে পারো, অর্থপিশাচ রূপোন্মাদ, কি আর কিছু—কিন্তু আমার এই স্ত্রী এবং কন্যা এরা আমার কিছুতে কোথাও নাই। এরা শুদ্ধ স্ত্রী আর কন্যা…

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দিন যেমন চলে, তেমনি চলিতে লাগিল, বিহারীর বুকে শুধু যে ঘা-টা বাজিল সেইটা আর সারিল না। বিহারী

বাড়ীর আবার সবাই হাসিল, গাহিল, বিহারীর পরে শুধু, সেই ব্যথাটা একটা, চিহ্ন রাখিয়া মুদ্রিত রহিয়া গেল। বিহারী আর কথা কহিতে পারিল না। স্তম্ভিতের ন্যায় জগতের দিকে এক করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া চাহিয়া রহিল। কন্যার দুঃখে বাপের যে এমন অবস্থা হইতে পারে, ইতিপূর্ব্বে এ দেশের লোক এরূপ কোথাও দেখে নাই। সকলে একবাক্যে কহিল পিতৃহৃদয় বটে! সেই সঙ্গে অনিন্দ্যাকে ধিক্কার দিতে কেহই ত্রুটি করিল না, সকলেই বলিতে লাগিল, "অনিন্দ্যা তুই যদি ফুলশয্যার রাত্রে পলাইয়া না আসিতিস্, তবে তোর স্বামী আবার দ্বিতীয় বিবাহ করিত না এবং তোর বাপেরও এ অবস্থা ঘটিত না।

অনিন্দ্যা তাহার সইকে কহিল ভাই আমার অদৃষ্ট! তোমরা আমার সুখের জন্য হাজার চেষ্টা করিলেও অদৃষ্টের হাত এড়াইব কি করিয়া? নির্জ্জনে বসিয়া যে পাতক করিয়াছি তাহার ফল ত ভোগ করিতে হইবে।

অনিন্দ্যা তাহার পিতার সেবা করে, পিতাকে খাওয়ায় দাওয়ায়, পিতাকে লইয়াই পড়িয়া থাকে, সংসারের সহিত আপনাকে আর পুরামাত্রায় খাপ খাওয়াইতে পারে না! তবে চক্ষু দুটা আছে, চাহিয়া দেখিতে হয়। তাহার সই

সাঙ্গাতীরা শ্বশুর বাড়ী হইতে বাপের বাড়ী পাল্কী চড়িয়া আসে, যায়, আনন্দ করে, কাহারও কাহারও সন্তান হইয়াছে, তাহারা সেই গুলি কোলে লইয়া তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে আসে, সে শুধু চাহিয়া দেখে। আর হৃদয়ের অতি .নিভৃতে একবিন্দু অশ্রু গলিয়া, ঝরিয়া যায়। হায়! তাহার সবই ছিল, সবই হইতে পারিত। শুধু কালো রংটুকু, আর বাপের আদরটুকু, লইয়া আসিয়াছিল বলিয়া কোথাও আপনাকে খাপ খাওয়াইতে পারিল না। না বুঝিয়া জীবনটাকে আপনার আপনিই ব্যর্থ করিয়া ফেলিল।

জাগরণের প্রথম প্রভাত হইতে তাহার অশ্রু, আজও তাহার অশ্রুমাত্রই সম্বল...সারা জীবনটাই সে কাঁদিয়া অতিবাহিত করিবে।

এমন সময় হঠাৎ আবার বিহারীর ব্যারাম বাড়িয়া গেল। কয়দিন হইতে তাহার চক্ষের জল আর থামিল না। কথা কহিবারও সাধ্য নাই। কি যে বেদনা তাহা জানাইবারও কাহাকেও সে সামর্থ্য নাই। বাড়ীর লোকে আবার ডাক্তার ডাকিতে গেল।

ডাক্তার আসিয়া কহিল, "এ সেই সন্ন্যাস রোগই—তবে এ দেড়বৎসর বিকারের ঘোরেই পড়েছিল। শেষ মুহূর্ত্তে, সম্ভব,...খুব অল্প সময়ের জন্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিতে পারে—

অনিন্দ্যা পিতার পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল বাবা আমার কি উপায় করে যাবে গো !—

বিহারী দুই হাত দিয়া অনিন্দ্যার মাথাটী নাড়িয়া দিতে লাগিল যেন এ একটা তার সান্ত্বনা দেওয়া...বাছা কি করবি বল এযে তোর নিয়তি।

বিহারীর ভগ্নী রাণীসুন্দরী কহিল, "দাদা আবার তোমার সুখের দিন ফিরে আসবে তুমিই শুধু তা দেখতে পাবে না ! অদৃষ্টের বিড়ম্বনা।...

সূর্য্যকান্ত আসিয়া কহিল, তোরা চুপ কর্ ও একটু শান্তিতে মরুক্। ওর যা সুখ হবে তা ওর আর জানতে বাকী নাই। আবার ওর জামাই আসবে, মেয়ের সুখ হবে, হ্যা...।

রাণী কহিল, দেখিস্ দেখিস্ আমার এ বাক্য মিথ্যে হবে না। বিছানার উপর পড়িয়া বিহারী ইঙ্গিতে সূর্য্য-কান্তকে ডাকিল। সূর্য্যকান্তের কাণের গোড়ায় মুখটী লইয়া অস্পষ্টস্বরে কহিল রাসবিহারী—

রাসবিহারী তাহার পুত্রের নাম।

রাস আসিলেই পুত্রের একটি হাত ধরিয়া, অনিন্দ্যার একটি হাত ধরিয়া উভয়ের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া

চাহিয়া রহিল, যেন ইঙ্গিতে জানাইতে চায় ; "রাস অনিন্দ্যা রহিল ইহাকে দেখিও।"

ডাক্তার কহিল, বুকের এমন একটা নারী ছিঁড়ে গেছে যাতে কথা কইবার আর কোন সামর্থ্য নাই। ওঃ কি হৃদয় হীন জামাতা।

রাসবিহারী কহিল জামাতাকে হৃদয়হীন কি করে বলি বলুন।" তিনি যখন জামাই মাত্র, বলুন যে আশ্চর্য্য অদৃষ্ট এই কালো মেয়ের...ও যে পথ দিয়ে চলে যাবে সে পথের মাটি পর্য্যন্ত জ্বলে শুকিয়ে যাবে।...আমাদের গের-স্থালীটা ছারখার হয়ে গেল।

দাদার স্নেহ যে কতদূর পৌঁছিবে। অনিন্দ্যা এইখানেই তাহার কতকটা আন্দাজ করিয়া লইল। কিন্তু সে অনু-যোগ করিবে কাহার কাছে যাইয়া? মা থাকিলে বরং মাকে একটা কথা বলা চলিত। অভাগিনীর কপাল দোষে মা-ও আগে হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

একদিন অনিন্দ্যার পিসী কহিল, "অনিন্দ্যা আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবি, সেখানে তোর স্বামী রয়েছেন, হাজার হোক স্বামী বটে ত কেঁদে কেটে পরলে আর কোথায় ঠেলে ফেলবে।...একটু ঠাঁই দেবেই দেবে। ঘরে দাসী চাকরও ত একটা রাখতে হয়।...

অনিন্দ্যা প্রথমটা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিল, বলিল যাইব। তার পর কি ভাবিয়া হঠাৎ তাহার পিসীমাকে কহিল, "না পিসী ও কথা আর ব'লো না। স্বামী থাকতেও যখন স্বামী অদৃষ্টে নাই তখন স্বামীর কাছে ভিক্ষা করতে যাবো? ভিক্ষে করতে হয় এইখানেই করবো! এত আমার বাপের ভিটে বটে, এখানে আমার কোন লজ্জা নাই! এইখানেই ধানসিদ্ধ করবো, মুরি চাল ভাজবো দুবেলা হরিনাম নেবো। আমার এইখানই ভালো!

রাণীসুন্দরী মনে করিয়াছিল একবার বেয়ে চেয়ে দেখিব। ইতিমধ্যে বিহারীর মৃত্যু হওয়াতে, সব গোলমালে চাপা পড়িয়া গেল।

সে যাত্রা, রাণীসুন্দরীর অনিন্দ্যাকে কলিকাতা লইয়া যাইবার আশা ত্যাগ করিতে হইল!

এ জগতে অনিন্দ্যার যে একটা আশ্রয়স্থল ছিল, তাহাও ভাঙ্গিয়া গেল। এখন কেবল কাঁদুক অভাগিনী। চক্ষের জলে আপনার পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করুক। স্বামী ত ত্যাগ করিয়াছেনই—মানুষেও কোন্ দিন আবর্জ্জনা বলিয়া ত্যাগ না করে।…তুমি বলিবে অনিন্দ্যার কি দোষ সে বালিকা ছিল। বালিকা বুদ্ধিতে যাহা করিয়াছে তাহার কি ক্ষমা নাই? কিন্তু নাই। যখন বাঙ্গালীর ঘরে কন্যা হইয়া

জন্মিয়াছ তখন মাতৃস্তন্য, হইতে তাহাম স্বামীর ঘর স্বামীর সংসার চিনিতে পারা উচিত ছিল।

কাঁদো অভাগিনী, দেশের মানুষ তোমার দুঃখে গলিবে না। কালো রূপ লইয়া আসিয়া আরও অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছ।



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অনিন্দ্যা মনে করিয়াছিল হাজার দুঃখ কষ্টের মধ্যে সে বাপের ঘরেই থাকিবে। বাপ মৃত্যুকালে যে ভাইএর হাতে হাতে তাহাকে সঁপিয়া গিয়াছে, সে ভাই তাহাকে আশ্রয় দিবে; অন্ততঃ একমুষ্টি, অন্নের কাঙালিনী হইয়া তাহাকে শ্বশুর বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া থাকিতে হইবে না।

কিন্তু অদৃষ্ট যাহার গোয়া হইতে বাদী, তাহার আবার শ্রেয়ো কোথায়?

পিতার মৃত্যুর পর হইতে ভাই রাসবিহারী তাহার উপর

এমন তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল, যাহাতে বোঝাইতে লাগিল সেই যেন তাহার পিতার মৃত্যুর একমাত্র কারণ।

অনিন্দ্যার আশা ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল যে ডাল আশ্রয় করিয়া সে একটু বাঁচিতে চাহিতেছে, সেই ডালই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ছেলে বেলায় গল্পে, যে সমস্ত দুঃখিনী কঙ্কাবতীর কাহিনী শুনিয়াছিল তাহাদের সকলেরই শেষে একটা না একটা আশ্রয় মিলিয়াছিল। কিন্তু তাহার আশ্রয় মেলা ত দূরের কথা, নিজের সহোদর ভাইএর দৃষ্টি পর্য্যন্ত, তাহার দিকে চাহিয়া বিষ হইয়া গিয়াছে। এত বড কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন কখন হইতে হইবে—অনিন্দ্যা তাহা কল্পনাও করে নাই। নিজের অদৃষ্টের দিকে চাহিয়া নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অনিন্দ্যা তাহার সইকে ডাকিয়া সব ভাঙ্গিয়া বলিতে লাগিল। দাদার সে দিনকার বউটা পর্য্যন্ত যে তাহাকে দশকথা শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছে; তাহাও বাদ পড়িল না।

সই কহিল শুনবে ভাই। তবে শোনো। আমরা জানি মেয়ে মানুষের স্বামীর ঘরই একমাত্র চরম আশ্রয় স্থল। সুখে, দুঃখে, আনন্দে বেদনায়, সেখানকার ধূলামাটি পর্য্যন্ত যে আশ্বাস দেয়, বাপের ঘরের সোণার সিংহাসনেও বুঝি সে আশ্বাস দিতে পারে না। তারা যেন বলে তুই আমাদের

আমাদের দুঃখের ঘরেও তুই থাক্। পারবি কি ভাই? স্বামী ত্যাগ করেছেন, করুন...তাঁর ভিটে আঁকরে পড়ে থাকতে? পারো যদি নিশ্চয় ব'লছি একদিন কূল পাবেই—

অনিন্দ্যা প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু মনে মনে ঠিক করিল, সইএর কথাটা একবার পরখ করিয়া দেখিতে হইবে। তাহা ছাড়া, শুধু ভাতের টান ব্যতীতও আর একটা কেমন টান তাহার নারীতে বাজিতেছিল; ইচ্ছা করিয়াও অনিন্দ্যা পিছাইয়া আসিতে পারিতেছিল না। যেন দিগ্বিজয়ী ঠাকুর, তাঁহার রথ হাঁকাইয়া রাজপথের উপর দিয়া চলিয়াছেন, হাজার লোক রথের কাছি ধরিয়াছে, সে কাছি ধরিতে পারে নাই তবু ভিরের মধ্যে তাহার অঞ্চল বাধিয়া গিয়াছে। তাহাকেও যাইতে হইবে। ওগো ঠাকুর দয়া-কর! পাছে ফেলে রেখোনা! দয়াল দেবতা সঙ্গে নাও! সঙ্গে নাও!

সেদিন রাসবিহারী আর তাহার পত্নী একসঙ্গে কহিল, এরকম সারাদিন এখানে কাঁদিয়া কাটিয়া চলিবে না। আপনার পথ দেখিয়া লও। তুমি যেখানেই থাকিবে, সেই খানেই আগুন লাগিবে।

অনিন্দ্যা কহিল কোথায় যাবো, তাই বলিয়া দাও। আমার কোথায় আশ্রয় আছে?

রাসবিহারীর বউ কহিল, কেন শ্বশুর বাড়ী—

রাসবিহারী স্বয়ং কহিল, শ্বশুর বাড়ীতে না পোষায়, যমের বাড়ীও চলে যেতে পারো, তাতেও কারও আপত্তি নাই! তুমি এই যে কবছর এখানে আছো,সে কবছর মাঠের দুর্ব্বাটি অবধি ফলিতেছে না—ফশল হওয়া ত দূরের কথা—

অনিন্দ্যা আর অনুযোগ করিল না।

পাতাসী বাগ্দিনী তাহার শ্বশুর বাড়ী চিনিত, পাতাসীকেই ডাকিয়া পাঠাইল। পাতাসীকে চুপি চুপি কহিল পাতাসী পারিবি। দেখছিস্ দুর্গতির আর সীমা নাই, তাই ভাবছি শেষ দেখিয়া তারপর মনে যা আছে তাই করিয়া যাইব। আমি ত সে গ্রামের পথ ঘাট ভাল চিনিনি, আর তুইও, সঙ্গে একবার গিয়েছিলি। তোকে সবাই চেনেও।...

পাতাসী কহিল যাইব।

অনিন্দ্যা কহিল তবে ভোরের বেলায় আসিস্।

অনিন্দ্যার ত সম্বল এখানে কিছুই নাই। শ্বশুরবাড়ী হইতে যে সব জিনিষ পাইয়াছিল, ভাজঠাকরুণ তাহা দখল করিয়া বসিয়াছেন। নিজের সম্বলের মধ্যে দুখানা মোটা কাপড়, আর শ্বশুর বাড়ীর সম্বন্ধের দিনের একখানা পাতলা সাড়ী, ঐখানি মাত্র পড়িয়া কোথাও যাওয়া যাইতে পারে—

অতিথি হইয়া কোন গতিকে স্বামীর ভিটায় একটু স্থান করিয়া লইতে চলিয়াছে, তাহার পক্ষে এ আর ভাল কাপড় পড়িয়া যাওয়া সাজে না। গহনা গাঁটি যাহা ছিল তাহাও দাদা মহাশয় খোরাকী বাবদ কাটিয়া লইয়াছেন। গহনার দিকে অনিন্দ্যার ঝোঁকও কথন ছিল না। তবু ভাবিল সোনার বালা দুগাছি যদি দেয়,…হাজার হোক সে সধবা ত?

দাদার কাছে চাহিতেই ভাজঠাকরুণ এমন উত্তর দিল, আর ও বালার কথা অনিন্দ্যা মুখেও আনিতে পারিল না। কেবল কহিয়া আসিল কাজ নাই। তোমরা পরিয়া সুখী হইও।

এত লাঞ্ছনা এত গঞ্জনা—তবু ভোরের বেলায় যখন এই বাড়ী জন্মের মত ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া জাগিয়া উঠিল; তখন কেন তাহার বুকের ভিতরটা এমন করিয়া মুষরিয়া উঠিতে লাগিল? সারারাত্রি সে কাঁদিয়াছে বটে,কিন্তু এমন ধারা তাহাব ভিতরটায় ত রক্ত পাত হইয়া যায় নাই, যেন তাহার ভিতরকার নারী হৃদয়টার দম বন্ধ হইয়া মরিবার উপক্রম হইল! যেন প্রাণ বায়ুই বা বাহির হইয়া যায়।

দুঃখ যাহার ললাট নিয়তি—এত শীঘ্র মরিবারই তাহার সে অবসর কোথায়?—

আজন্মের স্মৃতি সব, মুহূর্ত্তে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিতে

লাগিল। ওই পেয়ারা গাছটির তলায় ছেলে বেলা হইতে খেলাপাতি সাজাইয়া আসিয়াছে, ঐখানে তাহার সেদিন অবধি সেই ঘর কন্নার সামগ্রী পড়িয়াছিল। ধানের গোলার পাশে তাহার সঙ্গিনীদের লইয়া খেলিতে বসিত, ফটিক গণেশ কতজনে তাহার হাতের রাঁধা ভাত খাইয়া আনন্দ করিয়া গিয়াছে। আর ঐ যে বড় ঘর খানি,ঐখানে তাহার কত যে স্মৃতি, চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া আছে,কে তাহার সংখ্যা করিবে ? ঐঘরেই তাহার বাসর হইয়াছিল, ঐ ঘরেই আবার তাহার বাপের শেষের শয্যা পাতা ছিল ; আর ঐ কোনটিতে কখন্ কখন বাপকে ফেলিয়া ভাবিতে বসিত। পৃথিবী যেমন চলে, তেমনি চলিবে, এ গ্রামের একজনারও অনিন্দ্যার বিয়োগ হেতু বাজিবে না ! সবাই হাঁপ ফেলিয়া বলিবে আপদের বিদায় হইয়া গিয়াছে।

ঘাটের পথে পুরনারীরা কোলাহল করিতে করিতে যেমন প্রত্যহ চলে তেমনি চলিবে, অনিন্দ্যার কথা কেহ আলোচনাতেও আনিবে না। নদীর জলে আবার কত অনিন্দ্যা নাহিয়া যাইবে। এ অনিন্দ্যার খোঁজও হইবে না। গ্রামের ঘাট বাট প্রত্যেক স্থানের স্মৃতি অনিন্দ্যার মনে চিরকাল জ্বল্ জ্বল্ করিতে থাকিবে। শুধু তাহারাই মনে রাখিবে না। মনে রাখিতেন যিনি, ভাল বাসিতেন

যিনি, তিনি যখন চলিয়া গিয়াছেন—তখন আর কে অনিন্দ্যাকে মনে করিয়া রাখিবে ?

ঘরের বাহির হইয়া অবধি অনিন্দ্যার কত কথাই মনে হইতেছিল। সহসা সম্মুখের পিতৃশ্মশানের দিকে দৃষ্টি পড়ায়, পাতাসীকে কহিল, দাঁড়াও, বাবার শ্মশানটাতে প্রণাম করে আসি—তখনও গাছে পালায় একটু রাত্রি ছিল। পাতাসী দুর্গানাম করিতে করিতে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনিন্দ্যা চিতার সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, বাবা জন্ম জন্মান্তরে যদি, মানুষ হইয়া জন্ম নিই বাবা তবে তোমাকেই যেন বাবা পাই, আর তুমি যেন এমন কন্যা না পাও। এই কন্যার দুঃখে একদিন সুখ পাও নাই; কোটী কোটী চরণে প্রণাম করি বাবা।...আমি তোমার চরণে কোটী কোটী অপরাধে অপরাধীনী।...

পাতাসী ডাকিল এসোগো বেলা হয়ে যাবে।

অনিন্দ্যা কহিল, যখন বেরিয়েছি তখন যাবো৽...তবে দুদণ্ড বাবার চিতাটার সামনে দাঁড়িয়ে একটু কেঁদে নিই। আহা বাবা আমার ত নয় যেন দেবতা ছিলেন।



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ।

পথে আসিতে আসিতে অনিন্দ্যা জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ পাতাসী দিদি, পথে কোথাও গঞ্জ টঞ্জ মেলে না—তাহলে তুই দুটো খাওয়া দাওয়া করে নিতিস্ ।

পাতাসী কহিল রাস্তা ত সামান্য ক্রোশ তিনেক হবে, জলখাবারের বেলা নাগাইদ পেঁছে যাবো, দরকার কি গঞ্জে—

অনিন্দ্যা কহিল ত্যাখ্ বেরিয়ে এসেছি যখন, তখন শ্বশুরের ভিটেতে যাবোই—তবে বলছিলাম কি সন্ধ্যে নাগাদ্ যেতে পারলেই যেন ভাল হতো, এ দিন মান,পাড়ার লোক সব ভেঙ্গে পড়বে ..একত তাদের কোন আহ্বান নাই, পত্র নাই । যাচ্চি মুখ লুকিয়ে…আঁধাররাত হলে ভাল হয় না ?—তুই ভেবে দেখ না পাতাসী—আমি আর কি বলবো—

পাতাসী ভাবিয়া কহিল তুমি মন্দ বলো নাই অনিন্দ্যা—একটু গা ঢাকি আঁধার হলেই যেন ভাল ! গাঁয়ের ভিতর দিয়ে দিনের বেলায় যেতে হবে । কতজনে কে গা,-কাদের বৌ, কি বৃত্তান্ত জানতে চাইবে । বারুইপুরের কাছে যে গোপাল গঞ্জ আছে সেই খানেই দিনমানটা কাটিয়ে দেওয়া

যাবে। দুপয়সা দিলেই একবেলার দরুণ থাকবার ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। ভাবনা কি ?—আর তোমারও ত হাঁটা হাঁটি বড় একটা অভ্যেস নাই।

অনিন্দ্যা কহিল,না।

পাতাসী খানিক বাদে পথে চলিতেই চলিতেই কহিল ক-বছর আগে যদি, আজকের মত এম্‌নি বুদ্ধিটুকু তোমার হতো অনিন্দ্যা...তাহলে আজ এমন ধারা মুখ লুকিয়ে তোমায় যেতে হতো না...জমিদার বাড়ীর বৌ, কত পাল্কী ঘোরা ছুটতো তোমার সঙ্গে—

অনিন্দ্যা কহিল বরাত।...তুই আমি কি করবো বল্...দেখলি ত বাবা আমার, তাঁর মেয়ের জন্য খরচ পত্র করতে কসুর করেন নাই, চেষ্টারও বাকী রাখেন নাই, তা এ পোড়া কপালে সুখ নাই কি করবো ? স্বামী থাক্‌তেও স্বামী পেলাম না শ্বশুরের ভিটে থাকতেও একটু আশ্রয় নাই। ত্যাখ পাতাসী যত কিছু অদৃষ্ট !

পাতাসী কহিল তা যা বলেছ। আমাকে দিয়েই দেখ না। আমার অসুর অবতার স্বামী ছিল। দেশে কলেরা না এসে ভরা ষোল বছরে বিধবা হয়ে গেলাম...সে আর কতদিনের কথা ..নইলে আমাকেই কি আজ দেশে দেশে ঘুরতে হতো,আমারি ভাত কে খায় তার ঠিক নাই,পাতাসীও

অদৃষ্টের আলোচনায় আপনার জীবনের দুঃখের কাহিনী খুঁটিয়া খুঁটিয়া কহিয়া যাইতে লাগিল। পথের কষ্ট চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

গোপালগঞ্জে প্রবেশ করিতেই চারিদিক হইতে দোকান দাররা ডাকিতে লাগিল। এসো গো মাঠাকুরাণীরা আমার ঘরে ভাল খাবার দাবার থাকবার বন্দোবস্ত আছে।

পাতাসী সকলকে হাত নাড়িয়া অসম্মতি জানাইয়া, তাহার পরিচিত এক দোকান ঘরে উঠিয়া পড়িল!

দোকানদারকে কহিল, দণ্ড দুই এখানে থাকিব তারপর উঠিয়া যাইব।

পরিচিত খরিদ্দার বলিয়া দোকানদার আশ্রয় দিতে মোটেই ইতস্ততঃ করিল না। পাতাসীর পশ্চাতের ভদ্র ঘরের মেয়েটীর দিকে নজর পড়িয়া আরও বরং বেশী কিছু খাতির করিয়াই জায়গা দিল।—

তারপর পাতাসীর পরিচিত রামীর মা বামীর মা, ঝির দল, আসিয়া পাতাসীর সহিত আলাপ জমাইয়া তুলিল। অনিন্দ্যা পাতাসীকে আপনার পরিচয় দিতে বারণ করিয়াছিল। পাতাসী অনিন্দ্যাকে কলু বৌ বলিয়া লোকের কাছে জানান দিতেছিল।

একজন টেরিকাটা টপ্পাবাজ মোদকদের ছোকরা বলিল

এতো কলু বৌ ব'লে ধরবার যো নাই—পাতাসী, এ যে একবার সাক্ষাৎ শ্যামা মা।

পাতাসী অনিন্দ্যাকে ঘরের দিকে বসিতে বলিল। অনিন্দ্যা দেখিল জগতে তাহার অপেক্ষাও দুঃখী, মানুষ বাঁচিয়া রহিয়াছে, তাহারা প্রতিদিন প্রত্যূষে কাছের গ্রাম হইতে উঠিয়া আসিয়া, এই গঞ্জের দোকানদারদের ঘর ঝাঁটানো বাসনমাজা কাজগুলি সারিয়া যায়; বিনিময়ে যে পয়সা পায় তাহাতেই তাহাদের দিন গুজরাণ হয়। হাজার দুঃখ কষ্টের মধ্যেও হাসিমুখ লইয়া তাহারা চলিয়া যাই-তেছে।

অনিন্দ্যা পাতাসীকে ডাকিয়া কহিল, চলো পাতাসী: আর বেলা নাই।

পাতাসী উঠিয়া অনিন্দ্যাকে কহিল। কিছু মিষ্টি সন্দেশ নিয়ে যাবে না? সেখানে তোমার বড় যার দুটো ছেলে পিলে আছে।—

অনিন্দ্যা কহিল তাও বটে। কিন্তু পাতাসী হাতে যে একটি পয়সা নাই।

পাতাসী কহিল। আচ্ছা সে পয়সার জন্য ভাবনা নাই ওম্‌নি হাতেই কি যাওয়া যায়? ময়রাকে রসগোল্লা ও পানতুয়ার দেড়সের দিতে বলিল।

অনিন্দ্যা কহিল, অনেক দাম হবে না ?

পাতাসী কহিল তা হোক। এখন এসো।

অনিন্দ্যা কহিল। আমি সইএর কাছে একটা টাকা পাবো, চাইবার কথা মনে হয়। তুই আদায় করে নিস্।

পাতাসী কহিল তাই নিব। সে টাকা পাইবার প্রত্যাশা না করিয়াও নিজের পয়সা দিয়াই সন্দেশ কিনিয়া লইল। অথচ সেটুকু ভাঙ্গিয়া অনিন্দ্যাকে বলিল না। হাজার দুঃখী কাঙ্গালী সে হউক, তাহার মধ্যে ত মনুষ্যত্ব একটু ও আছে—

সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন তাহারা গ্রামে ঢুকিল। তখন পল্লীগ্রামের পথে লোক চলাচল বড় একটা নাই। এখানে সেখানে দুপাঁচজন পাড়ার ছোকরা একটা একটা ঘরের বাহিরের রোয়াকে বসিয়া জটলা করিতেচে তামাক খাইতেছে, যাহার কৌতুহল হইতেছে, পথিক দিগকে কোথা যাবে কাদের বাড়ী যাবে, বলিয়া প্রশ্নও করিতেছে।

পাতাসী সকলকে এক উত্তর দিল, বড় বাড়ী যাইব। বড বাড়ীর উপর আর কাহার কথা কহা চলে না, চুপ করিয়াই যাইতে লাগিল।

বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া কিন্তু, অনিন্দ্যার বুকের ভিতরটা ভয়ে, বেদনায় দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সন্ধ্যা বেলা হইতেই তাহার বুকটা গুর্ গুর্ করিতেছিল বটে, কিন্তু এমন ধারা নয়।

একদিন যে সে এখানে রাজ্ঞীর গৌরবে প্রবেশ করিতে পারিত সে কথা তাহার মনে হইতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল এই,বড় বাড়ীর চারিদিক হইতে যদি একটা ব্যঙ্গ উচ্ছসিত হইয়া তাহাকে ধিকার দিতে আইসে ; তাহা হইলে সে কোথায় দাঁড়াইবে ? তাহা হইলে, তাহার একুল ওকুল দুকুলই যে নাই। তাহার মনে হইল যেন সে সর্ব্বনাশের সাগর কিনারায় দাঁড়াইয়াছে, মাত্র একটি ঢেউয়ের অপেক্ষা—তারপর:সব শেষ···কিন্তু যদি ভগবান করুণা করেন, তাহা হইলে সে বাঁচিতেও পারে।

অনিন্দ্যা পাতাসীকে কহিল, খিড়কীর পথ দিয়া চলো, সম্মুখ দিয়া নয়।

অনিন্দ্যা খিড়কীর দুয়ারের:কাছটিতে দাঁড়াইয়া রহিল, পাতাসী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া খবর দিতে গেল। আর এক মুহুর্ত্ত মাত্র সময়, এই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে অনিন্দ্যার নিয়তি লিপির আর একটা অধ্যায় সমাধা হইয়া

যাইবে। সান্ধ্য আকাশের নক্ষত্র গুলি যেন করুণা বিগলিত নেত্রে অনিন্দ্যার দিকে চাহিয়া রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

রমা তখন সন্ধ্যা বেলায় রান্নাঘরে ছেলেদের রুটি খাওয়াইয়া লইতেছিল। একে ম্যালেরিয়ার সময়, তাহাতে দু একবার অসুখও তাহাদের হইয়া গিয়াছে। রমা তাহার সংসারে ছেলে কটিকে লইয়াই কাল কাটাইতেছিল, কালো বউএর অদৃষ্টে কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় কখন তাহার হয় নাই।

পাতাসী বাড়ী প্রবেশ করিয়া ডাকিল, কইগো বাড়ীতে কে আছো···আমরা এলাম।

রমা ঘরের ভিতর হইতে কহিল কে গা তোমরা···

পাতাসী কহিল একবার বাইরে বেরিয়ে এসেই দেখ না—

"ওমা এযে পুষ্প গ্রামের দেখছি সব ভাল আছে ?"

পাতাসী সন্দেশের হাঁড়িটা রোয়াকে রমার সামনে নামাইয়া কহিল, হাঁ। আমি একলাই আসি নি বাছা, তোমাদের মেজো বউ শুদ্ধ এসেছে—

"মেজো বউ ? বলকিগো কোথায় ?—

পাতাসী কহিল, বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এখন তোমরা না আশ্রয় দিলে দাঁড়ায় কোথায় ?·· বাপের ঘরে এদ্দিন ছিল তা বাপও ত আর নাই।

"ওমা আসবে বই কি ?···এও ত তারই ঘর সংসার, পুত্র বিশ্বেশ্বরকে কহিল ওবিশু তোর কাকীমা এসেছেন বুঝি ডেকে নিয়ে আয়, আমি ততক্ষণ হাতটা ধুয়ে ফেলি, বিশুকেও ডাকিতে যাইতে হইল না। অনিন্দ্যাই আসিয়া রমার চরণে প্রণতা হইল।

রমা হাত ধরিয়া উঠাইয়া কহিল, ওমা এযে একবারে চেনবার যো নাই। তিন বৎসর আগেকার মেজেবউ ত এ নয়। হায় হায় এমন প্রতিমা খানি দেখতে পেলে, বুঝি ঠাকুরপোকে আর একটা বিয়ে করতে হতো না!—হাত ধরিয়া ঘরে উঠাইয়া লইয়া গেল। ঘরের আলোতে দেখিল, নারীর দুই চক্ষু বহিয়া জলের ধারা ছুটিয়া যাইতেছে। তা কাঁদিবারই কথা—এ যে নিজের ঘরে নিজে অতিথি—এতবড় বেদনা আর কোথায় আছে—রমা পাতাসীকে কুয়ারপারে পা ধুইয়া আসিতে ও বসিতে বলিয়া বিশু পুঁটিকে কহিল, যা তোরা তোদের খুড়িমাকে প্রণাম করে আয়।

বিশু কহিল, কোন্ খুড়িমা—মা ?

রমা কহিল পুষ্পগ্রামের—

"বিশু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, দিদিমা যাকে বলে কালো বউ।"

রমা পুত্রকে একটা ধমক দিয়া কহিল, যা বল্লুম শুনে আয়।

বিশু পুঁটি দুজনেই তাহার কাকীকে প্রণাম করিবার জন্য সম্মুখে দাঁড়াইতেই, কাকীমা তাহাদের কোলে তুলিয়া অজস্র চুম্বন করিয়া ফেলিল !

বিশু তাহার খুড়িমার কোলে বসিয়া কহিল, দিদিমা ত এখানে নাই কাকীমা, দিদিমা কদ্দিন হলো ক'লকাতায় চলে গেছে। জান্‌লে কাকীমা, দিদিমা বড় আমাদের বকেন !—

পাতাসী পা ধুইয়া আসিয়া কহিল, গিন্নী মা কি এখানে নাই নাকি বড় বউ ?

রমা কহিল, তিনি ত এখানে বড় একটা থাকেন না, কখন কর্ত্তার অসুখ বিসুখ হলে এক আধবার দেখা দিয়ে যান।—তা ও দুপাঁচ দিনের মত।

রমা পাতাসীকে জল খাবার দিয়া, কিছু মিষ্টান্ন লইয়া অনিন্দ্যার কাছে আসিল।

অনিন্দ্যা জোর হাত করিয়া কহিল, দোহাই দিদি মাপ করো ; আগে দেখি ভাগ্যের বিধান কতদূরে—

রমা কহিল ভাগ্যের কি দেখবে তুমি ? তোমার ঘর তুমি এখানে এসেছ, থাক্‌বে...তাতে কারও কিছুই ত বলবার নাই ···কর্ত্তা ত, মাঝে একবার তোমায় নিতে লোকও পাঠিয়ে ছিলেন, তখন তোমার বাপের অসুখ, ভাইরা বুঝি ব'লে দিয়েছিল পাঠানো হবে না।" কর্ত্তা ত মাঝে মাঝে প্রায়ই তোমার নাম করেন !—

রমা চলিয়া গেলে অনিন্দ্য সকল মিষ্টান্নটুকু বিশু পুঁটু দুই ভাই বোনকে ভাগ করিয়া খাওয়াইয়া দিয়া নিজে একটু জলমুখে দিয়া ডাকিল, দিদি।

রমা রান্না ঘর হইতে কহিল, যাচ্ছি ভাই অনেক কথাই তোমার সঙ্গে আছে, দুটো ভাত চড়িয়ে দি, সঙ্গের মেয়েলোকটিও এসেছেন। আর ত ঝি বামুন রাঁধুনী নাই, এখন নিজে নিজেই সব রান্না বাড়া করে নিতে হয়।

উপরে কর্ত্তা আহ্নিক করিতেছিলেন। মেজো বউ কথাটা অল্লাধিক তাঁহার কাণে গিয়াছিল। তিনি বিশুর নাম ধরিয়া উপর হইতেই কহিলেন। বিশ্বেশ্বর বাড়ীতে কে এলো ভাই !—

রমা অপেক্ষাকৃত কিছু চাপা গলায় বিশ্বেশ্বরকে কহিল, বল তোর দাদা মশাইকে, পুষ্পগ্রামের মেজো খুঁড়িমা এসেছেন!

বিশ্বেশ্বর চেঁচাইয়া কহিল, পুষ্পগ্রামের মেজো খুড়িমা দাদামশাই···বিশু তাহার মাকে কহিল, মা খুড়িমা দাদা-মশাইকে প্রণাম করতে যাবেন না?

রমা কহিল, যাবে বৈ কি।—

বিশু আবার চেঁচাইয়া কহিল, তোমাকে এখুনি খুড়িমা প্রণাম করতে যাবেন দাদা মশাই!—

কর্ত্তা হরকুমার তাহাদিগকে শোনাইয়া একটু উচু গলায় কহিলেন। এত দিনের পর শ্বশুর বাড়ীর সংসার ব'লে মনে প'ড়েছে?—সদ্‌বুদ্ধি যে ঘটে এসেছে তবু ভালো। বড় বউকে কহিয়া দিলেন, ওগো বড় বউমা। একটু বুঝিয়ে স্থঝিয়ে রেখে দিও বাছা!—বেচারীর পিতা-ঠাকুরটিও মারা গেছেন!—

বাবার নামে অনিন্দ্যার বেদনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রমা তেম্‌নি চাপা নিচু স্বরে কহিতে লাগিল। এই বার আপনি ওর বাবা হোন্। এতদিন ছেলে বলে ত মনে পড়েনি। ছেলে যখন লাজ লজ্জার মাথা খুইয়ে এলো, তখন আদর করে রেখে দিন্।

বৃদ্ধ, রমার কথা শুনিতে পাইয়াও কিছু উত্তর দিতে পারিলেন না। উত্তর দিবে যে, সে এখন তাহার নব-পরিনীতাকে লইয়া কলিকাতায় পড়িয়া আছে।

বৃদ্ধ আবার আহ্নিকে বসিয়া গেলেন।

বাড়ীর সকলের খাওয়া দাওয়া হইলে পর, রমা অনিন্দ্যাকে ডাকিয়া, তাহাদের রাত্রের আহার সারিয়া লইল। তারপর একটা ঘরে অনিন্দ্যাকে বসাইয়া রাখিয়া কহিল তুমি একটু অপেক্ষা করো আমি আস্‌ছি। বলিয়া চলিয়া গেল। অনিন্দ্য ঘরের চারিধার তাকাইয়া—বুঝিল এই ঘরেই তাহার ফুলশয্যা হইয়াছিল। সে কতদিনকার কথা, ঘরের সকল দ্রব্যেরই নাড়াচাড়া হইয়া গিয়াছে। ফুলশয্যা রাত্রির একটা চিহ্নও আজ চক্ষে পড়ে না। একটা শুষ্ক ফুল অবধি না।

রমা আসিয়া কহিল, এখনও বসে রয়েছ মেজ বউ! আমি একটু কর্ত্তাটির পায়ে তেল দিয়ে আসতে গিয়েছিলুম একটু পায়ে তেল না হলে তাঁর ঘুম হয় না, কর্ত্তাটি কে বুঝেছ? তোমার ভাশুর...

অনিন্দ্যা কহিল, প্রতিদিনই দিয়ে দিতে হয়? কথাটা বলিয়া ফেলিয়া কেমন অপ্রতিভ হইয়া গেল।

রমা কহিল, রোজই নয় ত কি একদিন? তুমিও যদি

কোনদিন কর্ত্তাটিকে পাও তখন বুঝবে। এ যে নারীর কর্ত্তব্য—ভাই।

অনিন্দ্যা হাসি, কান্নায় মিশাইয়া কহিল, "আমি ত আর সে সুযোগ জীবনে পাই নি...জীবনে পাবো যে কখনো সে আশাও নাই, জান্তাম না দিদি, আমায় মাপ করো।

রমা হাসিয়া কহিল, পাগল! বিছানাটা পাতিয়া দিতে দিতে কহিল, মনে পড়ে মেজ বউ, এই ঘরে তোমার ফুলশয্যা হয়েছিল?

অনিন্দ্যা কহিল মনে পড়ে, কতদিনের কথা...তবু চোখের সামনে সব যেন ঝক্‌ছে।

রমা কহিল কি করব ভাই, ঠাকুরপোরও ঠিক বিবাহটা কর্ব্বার ইচ্ছা ছিল না। ঐ যে তাঁর মা-টি, তাঁর আর সবুর সৈল না। ছেলেটির বিবাহ দিইয়ে দিলেন তবে ছাড়লেন।—তোমাকে ত রান্না ঘরে বসে সব কথাই বলেছি। বাস্তবিক মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের কদর তিনি বুঝলেন না।

অনিন্দ্যা কহিল, আমিও তোমায় একেবারেই বলেছি ত দিদি। অদৃষ্ট। অদৃষ্ট ছাড়া দেখলাম পথ নাই। নইলে আমার জন্য আমার বাপ ত্রুটি কিছুই করেন নি।

রমা কহিল, সে ভাই আমি জানি।

বিছানাটা পাতা সমাপ্ত করিয়া তার পর হাসিয়া তাকের দিকটায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া কহিল, সব হলো তোমার মেজ বউ—শুধু স্বামীটিকে একবার এসময় কাছে এনে দিতে পারলুম না, ঐটুকু যা মনে কষ্ট রয়ে গেল! ঐখানে তোমার দেবতাটির ফটোগ্রাফ আছে দেখতে সাধ যায়, দেখো।...বলিয়া রমা বাহির হইয়া গেল।

পাতাসীকেও শুইবার জায়গা করিয়া দিয়া আসিয়া, ঘরের প্রত্যেক দোরটির শিকল বন্ধ হইয়াছে কি না দেখিয়া, আবার অনিন্দ্যার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় কহিল, আমরাও উপরের ঘরেই রইলাম! ভয়ের কোন কারণ নাই।

অনিন্দা কহিল না দিদি, আমার জন্যে কোন ভয় নাই তুমি শোও গে।

রমা চলিয়া গেল!

অনিন্দ্যা খানিক বিছানাটায় এ পাশ ও পাশ করিয়া উঠিয়া পড়িল। প্রদীপটা মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। অনিন্দ্যা সেটা আরও একটু উস্কাইয়া উজ্জ্বল করিয়া দিল। আজ তাহার হৃদয়ের তরঙ্গ কত? সহজেই কি নিদ্রা আইসে? বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, তিন কালের তিনটা অনিন্দ্যা সার দিয়া আসিয়া যেন এই ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া গেল

আজ তিন জনের কথা তাহাকে শুনিতে হইবে। আজ তিনটা অনিন্দ্যাই ব্যথিত, কে তাহাদের সান্ত্বনা দিবে? আশা দিবার যিনি, তিনি নাই—ভরসা দিবার যিনি, তিনি নাই। তবু এইখানেই একটু স্থান করিয়া লইয়া থাকিতে হইবে, নহিলে ত্রিসংসারে কোথাও স্থান নাই। কাঁদো—তিনকালের অনিন্দ্যা কাঁদো—আসিয়াছ, কাঁদিয়া...তোমায় যাইতেও হইবে কাঁদিয়া—

একবার ইচ্ছা হইল, স্বামীর ফটোগ্রাফটা দেখি কিন্তু ক্ষোভে লজ্জায় সে ধারটাতেই অগ্রসর হইতে পারিল না। ভাবিল, এত অবহেলায় যিনি ত্যাগ করিয়া আসিতে পারিয়াছেন, তাঁহার কাছে কি গুণ লইয়া আবার দাঁড়াইতে পারিব? তাহার অভিমানিনী নারীহৃদয় যেন দুঃখে ও বেদনায় মাটিতে মিশিতে চাহিল—জগতে আর সকলের কাছে নিঃসঙ্কোচে হাত পাতিয়া দাঁড়াইতে পারা যায়। কিন্তু নিজের স্বামী...যাহার অপেক্ষা আপনার জন জগতে আর কেহ নাই।...তাঁহার কাছে অতিথি হইয়া দাঁড়াইতে যে একবারে মাথা কাটা যায়।

অনিন্দ্যা দীপ নিভাইয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঐ দীর্ঘ শীর্ষ তালবৃক্ষের পত্রান্তরালে একটি ভাস্বর নক্ষত্র, তাহার চক্ষের সম্মুখে কি উজ্জ্বল আভাই বিকীর্ণ করিতে লাগিল!

অনিন্দ্যার মনে হইল, ঐ নক্ষত্র অনেকদিন আগে একবার নামিয়া আসিয়াছিল—আজও আবার নামিয়া আসিতেছে। জ্যোতির্ম্ময় হস্ত প্রসারিত করিয়া যেন অনিন্দ্যাকে ডাকিতেছে। অনিন্দ্যা চমকিয়া উঠিল!

অস্পষ্ট তন্দ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিল যেন তাহার মা শিয়রে বসিয়া কাঁদিয়া কহিতেছেন! চলে আয় আভাগী, এ পৃথিবীতে তোর স্থান নাই। তুই মন্দভাগ্য, মানুষ তোরে আশ্রয় দিবে না।

তন্দ্রাভঙ্গে অনিন্দ্যা শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু হতাশ হইতে পারিল না, ভাবিল এটা দুঃস্বপ্ন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কয় দিনের মধ্যে অনিন্দ্যা যেন নূতন এক জগতে প্রবেশ করিল, এ জগত তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল, অথচ অন্তরে অন্তরে ইহাই সে আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছিল। তাহাকে একটু চেষ্টা করিতেও হইল না। তাহার অধিকারে কোন্ মায়াময়ী অদৃশ্য প্রকৃতি তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া গেল?—জয় টীকা বহন করিয়া আনিল

বিশু আর পুঁটি।—তাহারা যে আহারে বিহারে "খুড়িমা খুড়িমা" করিয়া জ্বালাইতে লাগিল। এ উপদ্রবটুকুও কি আরামের।—তাহার ভিতরকার "মা"র যে আর সুস্থির থাকিবার উপায় নাই! শ্বশুর মহাশয়ও তাহার সেবার দাবী করিতে লাগিলেন। ভাশুর উপেন্দ্রনাথ, ভাঁড়ারের চাবি অনিন্দ্যার উপরে দিয়া বড় বউকে ও অধিকার ছাড়িয়া দিতে বলিলেন।

অনিন্দ্যার আবার কি চাই? সাম্রাজ্য ত তাহার এই খানে···এখানে সে সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছে, পূজা করিবার অধিকার পাইয়াছে। আর তাহার কি আকাঙ্ক্ষা করিবার আছে? এখানে রূপের আলোচনা নাই, ধন-গর্ব্বের আত্মপ্রাধান্য নাই। এখানে সে শুধু মা, জননী কল্যাণী, গৃহলক্ষ্মী—এখানে অনিন্দ্যার কোন নিন্দা নাই, তবে আফশোষ এই—প্রেমের পত্নী সে হইতে পারিল না।

বেদনাটা কাঁটার মত তাহাকে বিঁধিতে লাগিল। গোপনে পূজার জন্য ফটোগ্রাফ একখানা পাইয়াছিল যদি; কিন্তু সেখানে ফুলচন্দন ছাড়া আর কিছু দিবার অধিকার তাহার নাই। পূজারিণীর মত দেবতার দ্বারে আসিয়া শুধু অঞ্জলি দিয়া যাইবে—একবার দেখিতেও পাইবে না—দেবতা তাহার পূজা গ্রহণ করিয়া তাহার ভক্তিকে সার্থক করিল কি না—

শুদ্ধ পূজা।...তাই কি অন্তরের টানে? একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার গীতি কি ইহার মধ্যে স্তবের আকারে পুঞ্জীভূত হইয়া ছিল না? একবার চক্ষে দেখিলেনও না—শুধু লোকমুখে "কালো" শুনিয়া চলিয়া গেলেন।

রমা তাহার বেদনাটা ধরিয়া ফেলিল। কহিল, মেজ বৌ, ঠাকুর পোকে, একখানা পত্র লিখে দি, কেমন? কেবল লিখে দিই, যে কালোরূপ চক্ষে না দেখিয়া ভুল করিয়াছ, আজ স্বচক্ষে দেখিয়া চর্ম্মচক্ষুর সার্থক করো।

অনিন্দ্যা জোর হাত করিয়া কহিল, দোহাই দিদি এ অপমানটা হতে তুমি আমায় রক্ষা করো!—তিনি শুধু তোমার চিঠির খাতিরে আসবেন, তা তো সৈতে পারবো না। যখন তিনি আমায় গ্রহণ করেছিলেন, তখন কি শুধু খাতিরেই আমায় নেবার কথা ছিল? উপরে ধর্ম্মদেব সাক্ষী ছিলেন—না? তার চেয়ে এ আছি ভালো—

রমা কহিল, তোমার ভাশুর ব'লছিলেন বারীনকে একবার চিঠি দিয়ে এ বাড়ীতে আনা হউক। দুই স্ত্রীও অনেকের থাকে!

অনিন্দা কহিল, না দিদি কাজ নাই, তুমি বুঝিয়ে ব'লো, বড়্-ঠাকুরকে—আবার একজনের মনোক্ষুণ্ণ হবে। তাতে তার সন্তান হয়েছে। আমার কি, আমার এ উপেক্ষা

সয়ে গেছে...কিন্তু আমার সতীন সে সৈতে পারবে কেন? তবে আমার পক্ষে একটা আক্ষেপ এই...স্বামী থাকতেও একদিন চক্ষে দেখলুম না।

রমা কহিল, না সে হবে না, তুমি লিখিতে পারো না। আমি তোমার হয়ে পত্রলিখে দেব। লিখবো, কালো বউএর নাথ—একদিন তোমায় দেখা দিতেই হবে।

অনিন্দ্যা হাসিয়া কহিল, দিদি তুমি বড় দুষ্ট!

ইতিমধ্যে কাত্যায়নী ঠাকুরাণী একদিন বারীনের বড় কন্যা সুহাসিনীকে লইয়া, কলিকাতা হইতে এবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এখন এ অসময়ে আসিবার দরকার ছিল না। তথাপি যখন শুনিলেন, এতদিনের পর কালবৌ আসিয়াছে; তখন কালবৌকে একবার দর্শনটা দিয়া আসা,—দরকার বিবেচনা করিলেন।—সে মা-বাপ হারাইয়াছে বলিয়া সহানুভূতিতেও গলিয়া নহে। পরখ করিয়া লইতে, তাঁহার রাজ্যের প্রজা হইয়া ঠিক শাসনে আসিয়াছে কি না?—

কিন্তু লোকমুখে যে টুকু শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চিত্ত বেশ সুস্থির হইতে পারে নাই। যাহারাই যে পাড়াবেড়ানীর দল, একদিন কাত্যায়নীর সহিত তারস্বরে...সুরে সুর মিশাইয়া বলিয়াছিল। এমেয়ে দেশের

কলঙ্ক, তাহারাই আবার বলিল কি না—এ মেয়ে দেশের সকল বৌকে টেক্কা দিয়েছে, যেমনি কাজকর্ম্মে—তেমনি ব্যবহারে—

বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, এ যে সত্যই আর এক বউ। এ কালো ত আঁধার কালো নয়। এ যে শ্যামা ধরিত্রীর একটা উজ্জল তরঙ্গ!

কাত্যায়নী ঘরে প্রবেশ না করিতেই, অনিন্দ্যা শ্বাশুড়ীর পা দুটি ধোয়াইয়া দিয়া গামছা করিয়া পা মুছাইয়া লইল। যাহা বড় বউও কোন দিন পারে নাই—অনিন্দ্যা তাহাই করিল। কিন্তু কাত্যায়নী সেয়ানা মেয়েমানুষ—ভাবিলেন চতুর মেয়ের,শ্বাশুরীকে বশ করিয়া—স্বামী হস্তগত করিবার এও একটা ফন্দী হইতে পরে—মুখে কহিলেন যদিও, "খুব হয়েছে বাছা আর নয়"—কিন্তু মনে মনে কহিলেন তোমায় আরও অনেকখানি দেখিতে হইবে।

অনিন্দ্যা তাহার সতীনের মেয়েটিকে একেবারে বুকে করিয়া ছাদের দিকে লইয়া গেল। তাহা দেখিয়া ছোট পুঁটু একটু ঈর্ষা না করিয়াও পারিল না। তাহার মাকে কহিল, মা, কাকী রাঙ্গা দিদি নিলে।

রমা কহিল, দুষ্ট মেয়ে—রাঙ্গা দিদি যে ওর মেয়ে, তা জানিস?

এ কথায় কর্ত্রী মনে মনে একটু হাসিলেন, বাহিরে কোন কথা বলিয়া হাল্কা হওয়া তাঁর স্বভাব নয়। নহিলে এবাড়ীর বাহিরে হইলে—অনিন্দ্যার এই মাতৃত্বটা লইয়া একটু রঙ্গ করিতেন। বলিতেন "মা না বিয়ালো বিয়ালো মাসী—ঝাল খেয়ে মলো পাড়াপ্রতিবাসী।"

অনিন্দ্যা ছাদের উপর সুহাসিনীকে দুধ সন্দেশ খাওয়াইতে খাওয়াইতে, সুহাসিনীর দিকে ক্ষণে ক্ষণে চাহিয়া তাহার কি জানি কেমন হইয়া যাইতে লাগিল। ভাবিল এই কন্যা যাঁর ঔরসে জন্মিয়াছে, না জানি তিনি কত সুন্দর! কন্যার মুখে যখন এ লাবণ্য, তখন না জানি তাঁহার চারিধারে কত সৌন্দর্য্যই ঝরিয়া পড়িতেছে।

সুহাসিনী তাহার এই নূতন মায়ের দিকে চাহিয়া তাহার দুটি ছল ছল নেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আচ্ছা মা তুমি কাঁদচো কেন?

অনিন্দ্যা ব্যাকুল আগ্রহে সুহাসিনীর মুখে একটা চুম্বন দিয়া কহিল, কই মা আমি ত কাঁদিনি—

সুহাসিনী কহিল, ঐ কাঁদচো যে দেখতে পাচ্ছি—

অনিন্দ্যা চক্ষু মুছিয়া কহিল না ও কিছু না, হয়ত চোখে কিছু পড়ে থাকবে…কি জানিস্—তোর এই পোড়াকপালী

মায়ের চক্ষু দুটিও ডব্‌ ডবে।···আচ্ছা সুহাস, মা,এর আগে আমার নাম কথন শুনেছিলি?

সুহাস যদিও পাঁচ বৎসরের মাত্র মেয়েটি, তথাপি কথাতে একটি ধনি ছিল। কহিল। শুনিনি? মার মুখে তোমার কথা হাজার বার শুনেছি, শুনেছি, তুমি আমার সৎমা, আমার বাবার সঙ্গে তোমার প্রথম বিয়ে হয়েছিল। তাইতেই ত তোমায় একবার দেখতে এলুম! তুমিই আমার সৎমা—কেমন মা?

অনিন্দ্যা আর সামলাইতে পারিল না। তাহার চক্ষু দিয়া আপনি জল গড়াইয়া পড়িল। কহিল কি করে ব'লবো বল্।···আমিও শুধু শুনেছি মাত্র···নইলে আমি কেউই'নই—ভিখারিণী···তোর বাবার দুয়ারে, তোর মায়ের দুয়ারে ভিক্ষা করতে বেরিয়েছি—ভিক্ষা চাইছি, কত ভিক্ষা চাইছি, ব'লছি আমায় দাও! মেয়ে মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে বাঁচতে হলে যা চাই·· দাও—আশ্রয় দাও! সন্তান দাও! আরও কত কি—জান্‌লি সুহাস্—এই চাই চাই ব'লতে বলতে:আমিও কতকটা পাগল হয়ে গিয়েছি।—তুই বুঝতে পাচ্চিস্‌নে—আমি পাগল···

সুহাস ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বুঝতে পাচ্চি মা। আমার ভয় কচ্চে—তুমি ব'কোনা। আমায় নীচে নিয়ে চলো।

অনিন্দ্যা উন্মাদিনীর লক্ষণেই দাঁড়াইয়াছিল। চক্ষের সম্মুখে এইদৃশ্য যেন তাহার আর সহ্য হইতেছিল না। সেও ত আজ সবই হইতে পারিত। কি দোষে বঞ্চিত হইল? কে তাহাকে বঞ্চিত করিল? রূপের অভাব? রূপের অভাবটাই কি সব চেয়ে বড় অভাব? ভিতরটা একবার পরখ করিয়া দেখিয়া লওয়া ত উচিত ছিল। রূপই যদি বড় মনে হইয়াছিল—বিবাহের সময়ে একবারে অস্বীকার পাইলেই ত চলিত।—

অনিন্দ্যা আপনার মনেই আপনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিত, আর অধৈর্য্য হইয়া পড়িত। অথচ খুলিয়া কাহাকে বলিবারও সে সাহসে কুলাইত না। রমাকে পর্য্যন্ত কোন কথা বলিতে সঙ্কোচে মরিয়া যাইত। সতীনের কন্যাকে তাই বুকে পাইয়া বুকের কথাগুলি তাহারেই সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল।

সুহাস যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না—অনিন্দ্যাও সেটা জানিতেছিল, তবু তাহার নিবেদন করিয়া দিবার দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। আকাশ, বাতাস, উপরের দেবতা, যাহারা একদিন তাহার বিবাহ রাত্রে সাক্ষী হইয়াছিল তাহারাই শুনিল।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অনিন্দ্যা কহিল।

আচ্ছা সুহাস—তোর বাবার মুখে আমার কথা কখন শুনিস্ নি ?…

সুহাস কহিল, শুনিনি মা—কখনও শুনিনি—একদিনও না।

অনিন্দ্যা কহিল, তাহ'লে ভুলে গেছে—জানিস্…

সন্ধ্যা আকাশে তাহার কণ্ঠস্বরটা যেন একটা কান্নার মত শোনাইল !

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

সেদিন বারীন্দ্র আফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া একখানি পত্র পাইল। পত্রখানার হস্তাক্ষর দেখিয়া যাহা চিনিল, তাহাতে, এ হস্তাক্ষর যে তাহার পরিচিত নহে তাহা বুঝিল।

হাত মুখ ধুইয়া কিছু জলযোগ করিয়া তবে পত্রখানা পড়িতে বসিল। কিন্তু একি এযে একবারে নূতন সম্বোধন ! লিখিয়াছে, প্রিয়তম। অনিন্দ্যার গতি ! এতদিন পরেও কি দুঃখিনীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই ? আমি ত জানি না কি অপরাধে অপরাধী আমি, তবু…আপনি যে

দোষে দোষী ঠাওরাইয়াছিলেন এতদিনেও তাহার কি একটা দোষ খণ্ডিল না? না—খণ্ডিত হউক—শুদ্ধ একবার চোখের দেখা দেখিতে আসাতেও কি অপরাধ? ইচ্ছা করিলে আমিও যাইতে পারিতাম! কিন্তু বিনানুমতিতে যাইয়া দেখা করিলে—অপরাধ হইবে ভাবিয়া পারি নাই। অহল্যা পাষাণী, হাজার বৎসর পরেও শ্রীরামচন্দ্রের পদ স্পর্শ পাইয়া উদ্ধার হইয়াছিলেন। আমি কোন অপরাধে অপরাধি না হইলেও যে একবার স্পর্শ চাই। স্পর্শ চাই আপনার শ্রীচরণের—নহিলে আমার মুক্তি কোথায়?...নারী-জন্মের সব সাধ সব আশা বিসর্জ্জন দিয়াছি কিন্তু, এ আশাটুকু ত এখনও বিসর্জ্জন দিতে পারিনি, ভাবিতেছি মুক্ত হইব...আপনার অবহেলার পদ স্পর্শেও একালো সোনা হইয়া যাইবে। ইতি সেবিকা কালো বউ।

সমস্ত পত্রখানা যেন বারীণের হৃদয়ে, অপরূপ কাব্য কথার মত শোনাইতে লাগিল। এরূপ পত্র ত সে আশাও করে নাই। একবার ভাবিল কালো বউ, এ রকম করিয়া কি পত্র লিখিতে পারিবে? আবার ভাবিল, সে নহিলে এতটা আবেগ, পত্রের ছত্রে ছত্রে এমন করিয়া কে মিশাইতে পারিত?

কালো বউ যে লিখিতে পড়িতে জানিত না, তাহা

তাহার মনে হইল না। বিবাহের পরও একখানা পত্র পাইয়াছিল সে হস্তাক্ষর অনুরূপ ছিল বটে, হইতে পারে সে সময় অপরে কেহ লিখিয়া দিয়া থাকিবে। কিন্তু এই সত্য—এই সত্য পত্র! এতদিনের পর তাহার হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে, সে ডাকিয়াছে।—সে চাহে…তাহার প্রিয়তমকে।—

বারীন সম্প্রতি, তাহার দ্বিতীয় পত্নীর সহিত বেশ, ভাল করিয়া মিশিতে পারিতেছিল না। তাহার ভিতরে ভিতরে কেমন একটা বিতৃষ্ণার ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিতে ছিল। মোহিনী চাহে যেন তাহাকে গ্রাস্ করিয়া ফেলিতে, এমন করিয়া দাসীর মত নত হইয়া ত সে চলিতে চাহে না! তাহার উপর বৎসর বৎসর সে কন্যা সন্তানই জন্ম দিতেছে। এটাও বারীনের একটা মস্ত ভাবিবার কথা।

একবার ভাবিল একটা বিবাহও তাহার না করা উচিত ছিল আবার তখনি ভাবিল। না—পুরুষ হইয়া যখন জন্মিয়াছি—তখন এই পৃথিবী খানাকে ভাল করিয়াই ভোগ করিয়া যাইতে হইবে।

ডাকিল মোহিনী।

মোহিনী তখন ছেলেকে, দুধ খাওয়াইতেছিল। কহিল "এখন সে যাইতে পারিবে না।"

বারীন কহিল, আসিবার জন্যই ডাকিনি। বলছিলাম বারুইপুর হতে পত্র এসেছিল।

মোহিনী উঠিয়া আসিয়া কহিল, সুহাসিনী ভাল আছে, এখনও তার দিদিমা তাকে এখানে নিয়ে আসছে না কেন ?

"থাকলেই বা—দিদিমা ছাড়াও ত আর একটি লোক আছে।"

"ওমা কালো বউ এখনও সেখানে আছেন নাকি ?

"শুধু আছেনই না।—গৃহস্থালীর সব ভারই এখন তার উপরে—"

"তাহলে তুমিও একবার ওমনি যাও।"

"সেই মনেই করছি"

মোহিনী কহিল, যাবে…বল কি ? তা অসম্ভবও না—আর ত রূপের আকর্ষণ নাই ! যে রূপ ছিল, তা তোমারই লালসার আগুণে আহুতি দিতে ফুরিয়ে গেছে। এখন নতুনের দিকে ছুট্‌তে মন ছুট্‌বে বৈকি !

বারীন কহিল, জানো আমরা পুরুষ। আমরা উপায়ও করবো। আমরা ভোগও করবো !

"তা জান্তাম, সেই জেনেই একদিন ব'লে ছিলাম, সতীনকেও ঘরে নিয়ে এসো। তখন ত্যাগ সহজ ছিল—আর আজ…দিনের পর দিন, বন্ধনে জড়িত হয়ে যাচ্চি।

এখন ভবিষ্যৎ ভেবে আমায় চলতে হচ্চে, শুধু ত এখন আর আমি একলাটি নই। তিন্‌টে তিনটে মেয়ে পার করতে হবে। এখন তোমার পক্ষে চ'লে যাওয়াই যে সহজ। যাও ভোগ করো। সমস্ত জীবনই কেবল ভোগ করো। সেও রূপের ডালি সাজিয়ে ব'সে আছে! তুমি তাকেও জাহান্নমের পথ দেখিয়ে এসো! সেও বুঝবে! সরল বিশ্বাসের কি পরিণাম!

বিরক্ত ভাবে মুখটা ঘুরাইয়া বারীন কহিল। পায়ের তলায় দাসী হয়ে যার থাকবার কথা, তার এত কথা শোভা পায় না! জানো মোহিনী, তোমার এই লেকচারে তোমার ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হচ্চে, এবং তুমি স্ত্রীজাতির সতীধর্ম্মের অবমাননা করছো।

মোহিনী গলায় কাপড় দিয়া কহিল মাপ করো। এতটা না সইতে হ'লে, কাকা আমায় এক সতীন বর্ত্তমানে, তার উপরে আমায় দিয়ে দেবেন কেন? পৃথিবীতে কোথাও যে আশ্রয় নাই—বলিতে বলিতে নীচের ঘরে—এই স্বামীর জন্যই খাবার তৈয়ারী করিতে নামিয়া গেল!—এবং সেখানে ডাকা ডাকি করিয়া কাঁদিতে লাগিল!

বন্ধু রাজশেখর দেখা করিতে আসিলে, কহিল—ভাই কি আপদ। এখন আর একবার বাড়ী যাবারও নাম

করবার উপায় নাই। বুড়ো বাপ আছেন, তাঁকেও একবার দেখা করতে যেতে পাবো না? বলো ত এ কি অন্যায় আব্‌দার?...

রাজশেখর মুখ টিপিয়া কহিল, আব্‌দারের অনেক বাকী। দাঁড়াও যখন এক একটি মেয়ে পার করবে, তখন আবদারের বহর দেখবে।—তখন তুমি পঞ্চাশ টাকা, মাহিনার কেরাণী, এই নজির দেখাইলে চলিবে না। পাঁচ গণিত দশকের ধাক্কা সামলাইতে হবে। বারীন বিরক্তির সুরে কহিল কি জঞ্জাল! এই মধ্যবৃত্ত গৃহস্থের ঘরে, লোকের বিবাহ করাটাই জঞ্জাল।—আগে বুঝলে আমি একটা বিবাহও করতুম না। দেশটা এতেই নেবে যাচ্ছে...

রাজশেখর হাসিতে লাগিল!—

এদিকে পত্র লেখিকাটি, কেবলই অপেক্ষা করিতেছিলেন। কখন পত্রোত্তর আইসে। প্রতিদিনই ঝিকে জিজ্ঞাসা করে, দেখিয়া আয়, তোদের মেজোবাবু মেজো বউ এর নামে কোন পত্র লিখিল কি না।—

মেজোবউ তখনও তাহার বড় জায়ের কীর্ত্তি জানে নাই। সে দিবারাত্র সংসার লইয়াই মগ্ন হইয়া ছিল। সেদিন যখন তাহার নামে একখানা পত্র আসিল, এবং সে

পত্রখানা তাহার শাশুড়ী কাত্যায়নী ঠাকুরাণী পর্য্যন্ত দেখিলেন, তখন সে লজ্জায় মরিয়া গেল। সে ত আর লিখিতে পড়িতে জানিত না। বড়বউ রমাই তাহার পত্র পড়িয়া দিল।

অনিন্দ্যা কহিল দিদি তুমি কি অন্যায়ই করেছ? এর আগেও যে একখানা পত্র লিখেছ তা জান্তাম না! এসব মতলব পাও কোথা হ'তে তার ঠিক নাই। ছি ছি শাশুরীই বা কি মনে করবেন ভাব্‌বেন? আমার এই ঘর-কন্না করা, পূজা আশ্রয় করা, কেবলি বাহিক। কেবলি ভান, আমি যে স্বেচ্ছায় এ দাসীপনায় ভর্ত্তি হয়েছি তাতো আর তিনি ভাব্‌তে পারবেন না।—বলবেন, দিন কিনে নেবার জন্যেই সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছি, তারি জন্য তলায়—তলায় স্বামীকে পত্রলেখা হচ্ছিল। আর সেই পত্র আমার সতীনই যদি দেখে, কি ভাব্‌বে?

রমা হাসিয়া কহিল, তোর ভাবনার বালাই নিয়ে আমি মরে যাই মেজোবউ। নিজে দুঃখে কষ্টে পড়ে থেকে প'চবো, অথচ মুখ ফুটে নিজের অধিকারের জন্য একটা কথাও কাউকে ব'লবো না—সেই বা কেমন কথা? এই শ্বশুর ব'লো, ভাশুর ব'লো, জা বলো, ছেলে মেয়ে বলো। ঠিক আপনার জন এরা কেউ নয়। তোমার চরম দুঃখের

দিনে এরা কেউ নাই। কারণ এদেরও যে একটা একটা পরম বন্ধন রয়েছে। সেই জন্যই তোর আপনার জনটিকে ধরে আনবার জন্য যে একটু চাতুরী করেছিলাম—সেটা কি অন্যায় হয়েছে ভাবিস্? আর পুরুষ মানুষ একটু মিথ্যাই ভালবাসে।···একটু মিনতি করে, তুমি রাজা, মহারাজা তুমি দেবতা ব'লে গাইতে পারলে যদি গলে জল হ'য়ে যায়, মন্দ কি—বিশেষ তার উপরে আর কেউ নন। ইহকাল পরকালের দেবতা স্বামী—ভাগিস পত্র লিখেছিলাম তাই তুমি কালো বউ—তোমাকে প্রিয়তমা পর্য্যন্ত লিখতে পেরেছেন।

অনিন্দ্যা খানিক চুপ চাপ থাকিয়া কহিল, না দিদি আপনাকে ব্যবসার হাটে দাঁড় করাবো না—তা যতই দুর্গতির মধ্যে পচি। রূপ ত কোন জন্মে নাইই। হাজার দুঃখ কষ্ট স'য়েও এই খানেও যে পড়ে থাকতুম, তুমি তাও নষ্ট করলে বোধ হয়।—এর পর হ'তে পাঁচজনে যে আমায় "চিঠি নেকানী" বলে আঙ্গুল বাড়িয়ে হেসে যাবে, সে সৈতে পারবো না। শ্বশুর মশায় কাশী যাবো ব'লছেন যদি যান, আমিও সঙ্গে যাবো!

রমা কাঁদ কাঁদ প্রায় হইয়া কহিল, মেজোবউ তুই এই সব ছেলে পিলের মায়াও ভুলতে পারবি?

অনিন্দ্যা কহিল কি করবো ? যেতে ত চাইনি—কিন্তু বোধ হয় তাও ভুলতে হবে।···

রমা অনিন্দ্যার হাতে ধরিয়া কহিল, দোহাই মেজো।··· আমারি চিঠি লেখার জন্য চ'লে যাবো বলিসনে—তাহলে আমি বাঁচবো না। সত্যই আমি তোকে ভালবাসি—মায়ের পেটের ছোট বোনটির মতই তোরে দেখি, যদি তোর সুখ হবে ভেবে, একটা অন্যায় কার্য্যও ক'রে থাকি তাই ব'লে সেটা দোষ বলে ধরবি ?

অনিন্দ্যা মুহূর্ত্তে প্রফুল্ল হইয়া রমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল না দিদি।—আমি কায়মনে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, যদি আবার আমার মেয়ে জন্ম হয়, তবে যেন তোমাকেই জা রূপে পাই। আমার দুঃখের দিনের এমন বন্ধু পৃথিবীতে তোমার মত কেহ নাই।—

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মাঝখানে সাতটা বৎসর কাটিয়া গেল। তবু আসিব বলিয়া বারীন একবারও বারুইপুরের দিকে আসিতে পারিল না। ইহার মধ্যে কত ছুটি পাইয়াছে সে, কত

সুযোগও আসিয়াছে তাহার—তবু মোহিনীর বন্ধন এড়াইয়া একটি বারও কালাবউএর সহিত দেখা করিবার সে সুযোগ করিয়া তুলিতে পারিল না। একবার মাঝখানে বড় বউকে শুদ্ধ কলিকাতায় কালীঘাট দেখিবার নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবার মতলব করিয়াছিল। কিন্তু অনিন্দ্যা তেমন ভাবে কিছুতে আসিতে চাহে নাই।

ইহার মধ্যে কর্ত্তা হরকুমার কাশী চলিয়া গেলেন; অনিন্দ্যাও শ্বশুর মহাশয়কে ধরিয়া পরিয়া, কাশীতেই নিজের শেষ দিন কয়টা কাটাইবার সঙ্কল্প করিয়া সঙ্গে চলিয়া গেল।

কাত্যানীর দিন কতক কাশী থাকিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এই বারুইপুরেই কাশী জানিয়া, আর অতদূরে যাইতে পারিলেন না। বিশেষ মেজো বউ যখন গেল, তখন স্বামীর জন্য দেখিবার শুনিবার লোকেরও তেমন আর প্রয়োজন নাই। ছেলে মেয়েরা কত কাঁদিল, কাটিল, অনিন্দ্যা নির্ম্মমভাবেই সে কান্না দলিয়া চলিয়া গেল।

যেন এ সংসারের মধ্যে তাহার আর পোষাইতেছিল না। ক্রমাগত আপনার সহিত আপনি যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার চিত্ত এখন এমন

দেবতার আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল—যেখানে তাহার জীবনের সব তাপ, সব গ্লানি, অশ্রুজলে নিবেদন করিয়া সার্থক হইতে পারে।—সেই জন্য সে আর কাহারও নিষেধ মানিল না। বাহির হইয়া পড়িল।

হরকুমারও বুঝিলেন অভাগিনীর শূন্য হৃদয়টাতে যাই হউক একটা সান্ত্বনা ত চাহি, সধবায় বিধবা হইয়া কতকাল কাটাইবে? তিনিও কতকটা ইচ্ছা করিয়াই বিশ্বেশ্বরের পদপ্রান্তে, এই বিশ্বের উপেক্ষিতা—বঞ্চিতা—তাপিতা—নারীটিকে টানিয়া লইয়া গেলেন।

বারুইপুরে দুদিন একটু অভাব অনুভূত হইল। দুদিন একটু সকলকে বাজিল। তারপর দিন যেমন চলিতে থাকে তেমনি চলিতে লাগিল।

রমার মনে কেবল একটা বেদনা রহিয়া গেল যে, অনিন্দ্যা তাহারই কৃতকার্য্যতার ভারে পীড়িত হইয়া হয়ত চলিয়া গেল।—সে ত সংসারের কাজ কর্ম্ম লইয়া একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াই ছিল। সেই—তাহার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা আনিয়া দিয়াছিল—বলিয়াছিল নারী জন্ম লইয়া আরও পাইবার আছে, সেই জন্য একবার তাহাকে ষড়যন্ত্রের মধ্যেও টানিয়া আনিয়াছিল—এবং তাহার দেবতার কাছ হইতে পত্রও আনিয়াছিল, যে দেবতা তাহাকে করুণা

করিতে পারিত। দীর্ঘ সাত বৎসর এই অপেক্ষায় রাখিয়াও ছিল। তারপর আর মিথ্যা দিয়া কতদিন ঠেকাইয়ারাখিবে? অনিন্দ্যা পাষাণকে পূজা করিয়া আর কতদিন কাটাইবে? শেষকালে তাহাকে বাহির হইতেই হইল।

রমার এক দিনকার একটা ঘটনা মনে পড়িল। একদিন বাড়ীতে কিসের একটা উৎসব, বাড়ীতে লোক গিস্ গিস্ করিতেছে; অনিন্দ্যা যে ঘরে থাকিত সেই ঘরেই ভাঁড়ার হইয়াছে; অনিন্দ্যা তাহার পূজা আহ্নিকের আর একটু সময় করিয়া লইতে পারিতেছে না।

শাশুড়ী যখন উপর হইতে ক্রমাগতই তাড়াতাড়ি পূজা সারিয়া লইবার জন্য তাগিদ দিতে লাগিলেন, তখন এই বড় বউই তাহার একটা চৌর্য্য ধরিয়া ফেলিয়া কি নাকালটাই তাহাকে দিয়াছিল—অভাগিনী পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়াছিল পর্য্যন্ত—সে চুরি ডাকাতিও কিছু করে নাই অথচ চৌর্য্য অপবাদটা তাহাকে লইতে হইয়াছিল। আবার সে চুরীর ধনকে দেখাইয়া দিয়াছিল, এই বড় বৌ—কুলুঙ্গির পরে এ বাড়ীর মেজো বাবুর যে ফটোগ্রাফটি ছিল, সেটিকে সে প্রতিদিন ফুলে চন্দনে অভিষিক্ত করিয়া সেখানে মাথা নোয়াইয়া চলিয়া আসিত। এবং সেখানে তাহার ছোট বাক্সটি দিয়া ছবিখানিকে আড়াল

করিয়া ঢাকা থাকিত। ছেলেদের বলিত ওখানে ঠাকুর আছেন হাত বাড়াতে নাই। ছেলেরাও সে কথায় ভুলিয়া থাকিত। কিন্তু বড় বউকে ত সে আর ছাপাইতে পারিল না। বড় বউ কহিল, এই যে মেজো—তবে যে বলিস্ স্বামী আমার কেউ নয়!—মেজো তখন বড়বউএর পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল।—দোহাই দিদি, কাউকে ব'লো না—বলো যদি আত্মহত্যা করবো—তোমরা সতী ভাগ্যবতী, প্রত্যক্ষ দেবতার পূজা করো—আমি অভাগিনী ছবির উপর দিয়েই আমার ভক্তি ছড়িয়ে আসি!—এ ভক্তিতে যে কিছু প্রাণ আছে—কি সত্যি আছে—তা নয় কেবল পরকাল ভেবে; এজন্মে ত এই ফল হ'লো—আনাস্তি জন্মে যেন পতি পূজা ক'রে পতির—আদর পাই—আর কিছু না। তারপর তার সে কি কান্না! ওঃ বড়বউ যতক্ষণ না স্বীকার করিল যে কাহাকেও বলিব না ততক্ষণ তাহাকে আটক করিয়া রাখিল।

কথাটা মনে পড়িয়া রমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া পড়িল। এই জন্য যখন তখন ঐ ঘরটার মধ্যেও প্রবেশ করিতে তাহার মনটা কেমন কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত।

হাজার প্রয়োজন হইলেও ও ঘরে ভাঁরার করিতে চাহিত না, এবং যে কেহ নবাগত ঘরের মধ্যে পদার্পণ

করিত, তাহাকেই কুলুঙ্গিটি দেখাইয়া বলিত ওখানে মেজো বউএর পূজার সামগ্রী আছে, সাবধানে চলিয়ো !—

মোটের মাথায় বড়বউ রমারই হৃদয় যা কিছু তার জন্য মাঝে মাঝে কাঁদিয়া উঠিত।

তাই সাত বৎসরের পর বারীন যখন কন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণের জন্য বারাইপুর আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সব চেয়ে বেশী রাগ হইল এই রমারই—

রমা কহিল। এতদিনের পর আসতে পারলে পাষাণ ? ...আর কয়মাস আগে আস্‌তে পারলে না ? তার একবার চক্ষে দেখার সাধটাও মিটতো।—

বারীন কহিল, সত্যই তার মন কি—আমার দিকে পড়েছিল বড়বউ ?

"কেন চিঠিতে দেখতে পাওনি ? তুমিও ত চিঠির উত্তর পর্য্যন্ত দিয়েছিলে।—"

"দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু তারপরে মনে হয়েছিল মেজোবউ লিখতে পড়তে জান্তো না !—"

রমা দৃঢ়স্বরে কহিল, তা নাই জানুক, তবু সে লেখায় তার সায় ছিল—এ কথাটা ত মানতে হবে। পুরুষ এতদূর পাষাণ হ'তে পারে তোমাকে দেখবার আগে তা মনে হয় নি, কিন্তু এখন দেখ্‌লাম—বলিতে বলিতে তাহার স্বর

কম্পিত হইয়া উঠিল। কম্পিত স্বরে কহিল, সাতটা বৎসর এখানে অপেক্ষা করে পড়ে রইলো—তবু একটি দিনের তরে তাকে দেখা দিয়ে যাবার—সে সুযোগ ক'রে নিতে পারলে না? আজ এলে? আচ্ছা পত্রই যেন তার মিথ্যে? একবার দেখসে দেখি—বলিয়া রমা বারীন্দ্রকে টানিয়া মেজো বউএর ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। কুলঙ্গীটার পর্দ্দা সরাইয়া ফটোগ্রাপটা দেখাইয়া কহিল, দেখ দেখি—প্রতিদিন ফুল চন্দন দিয়ে পূজাক'রে এম্‌নি করে, সাতটা বৎসর কাটিয়েচে, তোমার কোন ছেলে বেলাকার ফটোগ্রাফ,—তবু সেই রত্তি সে সাতরাজার ধন মানিকের মত—সন্তর্পণে বুকের কাছে জড়িয়ে রেখে দিয়েছিল।—যখন কাশী যায় তখনও নিয়ে যেতে চেয়েছিল—আমিই নিয়ে যেতে দিইনি, বল্লুম—বিসর্জ্জন দে।—সাতবৎসর পূজা করেছিস্—আর দরকার নাই! পাষাণের দেবতা হ'লে সে-ও কেঁপে উঠতো ··আর তুমি মানুষ তাতে মোহিনী স্কন্ধের উপরে···একদিন ইচ্ছাও হয়নি? সে এখানে আছে ব'লে দেশের গণ্ডীটাও মারালে না!—অথচ আজ ভাল মানুষটির মত বলতে পারলে—সে কি আমায় চেয়েছিল? ঠাকুরপো পুরুষ তোমরা অনেক উপায় সুপায়ই করো—মেয়েমানুষের মন তোমরা চিনলে না? কবে

একদিন বালিকা বয়সে ভয়ে এখান হতে পালিয়ে গিয়েছিল, তার জন্য সারাজীবনটা তাকে আগুনে পোড়ালে—সে গুমে গুমে পুড়ে খাক হয়ে গেছে সত্য।—কিন্তু সে আগুনের তাত পোহাতে হবে তোমাদেরও—

বারীন স্তম্ভিত হইয়া গেল। মেয়ে মানুষ এত নিঃশব্দে তার পূজার ঘরে ধূপটির মতই যে পুড়িয়া ছাই হইতে পারে, তাহা তাহার ধারণাই ছিল না!—চিন্তিত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অনিন্দ্যার শূন্য খাটখানার ধারে বসিয়া পড়িল!—

রমা কহিল, যতই লেখা পড়া শেখো তোমরা—যতই উপার্জ্জন করো তোমরা—মানুষকে মনস্তাপ দেওয়ার ফল একটা আছেই—তা এ জন্মেই হোক, আর পর জন্মেই হোক। এর দণ্ড তোমায় নিতেই হবে। সে এমন সতী সাধ্বী পাছে তোমার অমঙ্গল হয় ভেবে, একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলে নি।...শুধু মুখে বলেছে "দিদি আমার কপাল ভাল নয়।" ঠাকুরপো! শুধু কালোরূপটাই চক্ষু ঢেকেছিল।—সেই কালো রূপের নীচে যে প্রাণখানা আছে তার দিকে ত নজর পড়ে নি!—তবু তোমায় ভাগ্যবান বলতে হবে—আজ পর্য্যন্ত মোহিনীর আদরও সমান ভোগ কচ্চো।

বারীন অনেকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল। মেয়ের বিয়েটা

ঢুকে ঢুকে যাক্! তারপর আমি মনে কচ্চি, ছুটি না পেলেও আমার আপনার লোক ·কাউকে দিয়ে মেজোবৌকে আন্তে পাঠাবো। তা হ'লে আসবে না? আমি পত্রে লিখবো যে আমার আপিসের ছুটি নাই।"

"তা হয়ত অস্তে পারে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এতদিন কি একটি লোক জুটে নাই?" বলিয়া রমা কর্ম্ম করিতে গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

বারীন সেই খানটাতেই বসিয়া রহিয়া গেল। এই গৃহের সমস্ত আসবাব, এমন কি কড়িকাঠগুলা পর্য্যন্ত যেন অনিন্দ্যারই প্রতিনিধি হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। যেন তাহাদেরও একটা একটা করুণ দৃষ্টি রহিয়াছে··· তেমনি জলভরা···অভিমান ভরা।—

বারীনের কতদিন আগেকার ফুলশয্যার রাত্রির কথাটা মনে পড়িল। সে রাত্রিতে সে একবার বিছানার ধার-টুতেও আইসে নাই, বাহির হইতে অতি অবহেলায় মালাগাছটা ছুঁড়িয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। আর সে··· সেই অনাদরের মালাটিও তার দেবতার দেওয়া মনে করিয়া সযত্নে বক্ষে ধরিয়া রাখিয়াছিল।

বারীন মাথা তুলিতে পারিল না। আজ তাহার তেজ, গর্ব্বই বা কোথায় গেল? এই বিরাট, মহান, মহিমান্বিত

তীর্থে—সে যেন অভিভূত হইয়া যাইবার মত হইয়া পড়িয়াছিল। এতটা নিঃশব্দে আত্মাহুতি—ফলাকাঙ্খা রহিত হইয়া…উপন্যাসেও যেন এরকম কাহিনী সুদুর্লভ! একটা চোখের দেখার, পর্য্যন্ত কামনা ছিল না!—

বাহিরে আসিয়া বড় বউকে কহিল। বড়বউ আমার পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সুহাসের বিয়েটা চুকে গেলেই—বিয়েতে যদি তারা নাই আসছে, আমি বিয়ের পরই যাবো কিম্বা নিশ্চয়ই লোক পাঠাবো।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুহাসিনীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে, বিবাহের দুর্যোগের কথা আর সবিস্তারে বলিবার আবশ্যক নাই। কয়েক দিন পরে বারীন, একদিন তাহার মায়ের পায়ের কাছটায় নিতান্ত ক্ষুন্ন ভাবে বসিয়া পড়িয়া কহিল। মা তোমার গৌরীদানের বেশ ফল হ'লো। তখনই বলেছিলাম, এত অল্প বয়সে মেয়ের বিয়েতে কাজ নাই। বল্লে কবে মরে যাই—সুহাসের বিয়েটা দেখে যেতে দিবিনে? এখন জামাইএর হাঁই সামলাও। শুনছি দানসামগ্রী চেন ঘড়ি নাকি জামাইএর

পছন্দ হয়নি—তারা মেয়ে পাঠাবোনা বলেছে। সেই অত-রত্তি মেয়ে সে কি শ্বশুর বাড়ীতে থাকতে পারে? কি ব'লবো বলো?

কাত্যায়নী চক্ষু কাপালে তুলিয়া কহিলেন, সে কিরে—সে যে আমার দুধের মেয়ে, তাকে পাঠাবোনা ব'লতে পারে, এমন পাষণ্ডও ইহ সংসারে আছে?

কাছেই রমা ছেলেদের খাবার পরিবেশন করিতেছিল আর থাকিতে পারিল না। কয়দিন হইতেই সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল, বলিবার সময়ও যে তাহার না ঘটিয়াছিল এমন নহে। কিন্তু শাশুড়ীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সম্মুখে ঠিক খাড়া হইয়া বলাও যে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। আজ দেখিল পাষাণ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই সুযোগে সেও আর ছাড়িল না—বলিয়া উঠিল এমন পাষণ্ড ঘরে ঘরেই আছে। তারপর জনান্তিকে কহিল। পরের মেয়ে ঘরে এলে, যখন তাকে বন্ধ করে রাখা যেতে পারে—তখন ঘরের মেয়ে পররে ঘরে গিয়ে আট্‌কা থেকে যাবে—সেটা ত আর বড বেশী আশ্চর্য্য নয়। সবাই পাওনা দার—পাওনা আদায় করবে তবে ছাড়বে।

কাত্যায়নী কহিলেন, আমাদেরও ত বাছা ছেলের বিবাহ হয়েছে এমন ধারা ত দেখিনি। মেয়ে পাঠাবো না

একদিনের তরে বলিনি। টাকা-দানসামগ্রী পছন্দ না হলে দুকথা বলা যেতে পারে বটে। আমাদের তত দামী দামী অলঙ্কারপত্র, খাট, বিছানা, তাও অপছন্দ? জানি না বাপু কি রাজা বাদশা তাঁরা।—নিজের কপালটা চাপরাইয়া কহিলেন, ওরে বাপ্‌রে এসংসারটা কি কসাই খানা হয়ে গেল?—

রমা ছেলেদের যেমন খাওয়াইতেছিল,তেমনি খাওয়াইতে খাওয়াইতে জনান্তিকে কহিল। কসাইখানা—তোমরাই যে করেছ ঠাকরুণরা—তোমাদের মেয়ে ছিলনা তাই ছেলের মা হয়ে মেয়েদের বাপ-মাদের দরদ একটু বোঝনি—এখন বোঝো। নিজের বুক দিয়ে বোঝো—

কথাটা বারীনের কর্ণে গেল। বারীন কহিল, ঠিক বলছো বড় বউ, মাকে একটু একটু শুনিয়ে শুনিয়েই বলো প্রায়শ্চিত্ত হোক। আমার ত যথেষ্ঠ হচ্ছে—

কাত্যায়নী কহিলেন, ও বারীন তুই আজ একবার যা বাবা, বাছা আমার পাল্কীতে ওঠ্‌বার সময় দুটি হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ব'লে গেছে দিদিমা, আমায় তিন দিন পরে নিয়ে এসো। সে যে আমার দুধের মেয়ে বারীন।

রমা কহিল। ওমনি দুধের মেয়ে সবারই।

কি করবে বলো।...কসাইদের ত আর দয়া মমতা নাই!

বারীন কহিল, ঠিক হচ্চে—আমায় পায়ের ধুলো দাও বড় বৌ। সংসারে মা-দের একটু শিক্ষা হউক। নিজের বুকে না বাজলে শেলের মর্ম্ম বোঝা যায় না। উচ্চৈঃস্বরে কহিল,শুনেছ মা...এখনও হাজার টাকার মকর্দ্দমা...পারবে দিতে? আমি ঠিক করেছি আমার আর মেয়েতে প্রয়োজন নাই। যাই হোক নিজেরও জ্ঞানকৃত পাপও ত একটা রয়েছে। মেজো বউএর কথাটা ত উড়িয়ে দিলে, চলবার জো নাই।

কাত্যায়নী কাঁদিয়া কহিলেন, তুই যা বাবা—মেজো বউকে কষ্ট দেওয়ার দরুণ যদি এই শাস্তি হয়,—তুই আজই কাশীতে গিয়ে মেজে বউএর কাছ হতে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আয়—আর তুইও ত যাবোও ব'লেছিলি।

বারীন কহিল, দাঁড়াও আট্‌টা বৎসর যেতে দাও। তবে আবার কথা পেরো।

কাত্যায়নী কহিলেন না বাবা তুই আজই যা, সুহাসের মুখখানি মনে প'ড়ে যে একদণ্ড স্থির হ'তে পাচ্চিনে—সে যে আমার সাক্ষাৎ গৌরী। বরং মেজো বউকে শুদ্ধ সঙ্গে করে ও নিয়ে আসতে পারিস্!

"আজ যে গরজ বড়" বলিয়া রমা গৃহান্তরে চলিয়া গেল। এবং একখানি পত্র বারীনের হাতে দিয়া কহিল। এই পত্র মেজো বউ তাদের বাড়ীওয়ালার মেয়েকে দিয়ে লিখিয়ে আমায় পাঠিয়েছে। প'ড়ে দেখ। এতদিনের পর তুমি স্বয়ং গেলেও আসবে কিনা সন্দেহ! অনেক দেরীতে যাচ্ছো ধরতে পারো কিনা ভাববার কথা। পত্র পড়ে তবু কতকটা বুঝতে পারবে।

বারীন সাগ্রহে রমার হাত হইতে পত্রখানা লইয়া পড়িতে লাগিল—

অনিন্দ্যা লিখিয়াছিল।

দিদি শুনিতেছি সুহাসের বিবাহ! শ্বশুর মহাশয়ের কাছ হইতেই এ খবর শোনা গেল। বিশ্বেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি সুহাস আমার ভাল বরের হাতে পড়িয়া সুখেই থাকুক। হতভাগিনী আমি। আমার এমন একটা পয়সা সম্বল নাই—যে সুহাসের নামে, তার শুভদিনটি স্মরণ করে কিছু পাঠাই! টাকাই কখন চক্ষে দেখিলাম না, তা টাকা পাঠাইব? তুমি তার বিবাহে যাইও। আর আমার হইয়া একটা আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিও! অধিক কি বলিব। দিদি তুমি জানিতে চাহিয়াছিলে কাশীতে কেমন আছো? খুলিয়াই বলিতেছি, এতটা শান্তি, এতটা তৃপ্তি

জীবনে কখন পাই নি—জীবনের সব মায়ার বন্ধনগুলি যেন এখানে আসিয়া একে একে টুটিয়া পড়িতেছে। অপূর্ব্ব মহিমাময় দেবতা! সংসারের সাধ, আশা, যাহা তুমি আমায় সর্ব্বদাই শোনাইতে—এবং যে রসে আমারেও ডুবাইয়া মারিবার উপক্রম করিয়াছিলে—এই দেবতার ঠাঁইয়ে আসিয়া সে মোহ আমার কাটিয়া যাইতেছে। দেখিতেছি, আমার অপেক্ষাও অনেক অভাগিনী ঠাকুরের পদপ্রান্তে শরণ লইতে আসিয়াছে। একটা জন্ম এই রকম ব্যর্থ হইয়াই কাটিয়া যাউক। আমি এবার কামনা করিতেছি, ঠাকুর আর যেন আমার জন্ম না হয়। তুমিও আমায় ঐ আশীর্ব্বাদ করিও দিদি!

পত্রখানা শেষ করিয়া বারীন কহিল। মা আজই রাত্রে,—আজই রাত্রে আমার কাশী রওনা হতে হবে। মাঝে আর দুটি দিন মাত্র ছুটি আছে। ঠিক হবে, এবারে একবারে নিয়েই আসবো।

বড় বউ একটু পরিহাস করিয়া কহিল, হাঁ নিয়েই এসোগে—আমরা এখানে বাসর সাজাই।

মোহিনী অন্তরালে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ সমস্তই শুনিতেছিল। আর একটা প্রবল বিষের জ্বালায় ভিতরে ভিতরে ছট্ ফট্ করিয়া উঠিতেছিল। অথচ স্বামী যে সতীন

আনিতে যাইবে, তাহাতে তাহার নিষেধ করিবারও সে জোর চলিয়া গিয়াছিল। কারণ এটা তাহাকে শুনিতে হইয়াছে যে, হাজার হোক অনিন্দ্যারও তাহার স্বামীর পরে একটা দাবী আছে, তাহার অধিকার তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

বারীন উপরের ঘরে উঠিতেই মোহিনী কহিল, কি গো।—বড় যে তাড়াতাড়ি—আর সবুর সৈছে না বুঝি ?

বারীন কেবল মোহিনীর মুখের দিকে একবার চাহিল কোন উত্তর দিল না। দেরাজ হইতে কয়েকখানা নোট বাহির করিয়া মনিব্যাগটায় রাখিয়া দিল।

মোহিনী সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভঙ্গীর সহিত হাত নাড়িয়া কহিল, মনেও ঠাঁই দিও না—সতীনের সঙ্গে একসঙ্গে ঘর কন্না করবো ? তোমার আজ দরদ বেশী লেগেছে—যাও। আর ত অন্ধকার নাই,মেঘ কেটে গেছে। ফুট্ ফুটে জ্যোৎস্না —গা ঢেলে দাও। কিন্তু জেনে রেখো আমারও নাম মোহিনী—

বারীন তীব্র স্বরে কহিল। একবার চোখের দেখা দেখে আস্‌তেও তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে ?—আর সে যে তার সমস্তটা জন্ম…সম্মুখ হতে সরে দাঁড়াও! আমি আজ সাধেই বেরিয়ে পড়িনি। ধর্ম্মের দিক হতেও যে একটা

নাড়া খেতে হচ্ছে···মেয়েটাকে যে তার শ্বশুররা পাঠাতে চাচ্চে না তার খবর রাখো ?

"কেন কালো রাণী এসেই আমার মেয়ে উদ্ধার করে নিয়ে আস্‌বেন নাকি ? ব'লতে লজ্জা করে না ? যেদিন আমার গা ছুঁয়ে শপথ করে ছিলে, যদি কালো বউএর সঙ্গে জীবনে কথা কই—তবে সে আমার স্ত্রী নয়। মনে পড়ে না— ?"

বারীন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, দূর হও সর্ব্বনাশী, মেয়ে মানুষের মন যে এতটা নীচ হতে পারে তা কখনও ভাবিনি, তার সঙ্গে কিছু ঘর কন্নাও পাতাতে যাচ্চিনে, তবু এই রকম ? নরক ! নরক ! আমার চারিদিকে নরকের আগুন জ্বলে উঠেছে। বলিয়া সিঁড়িতে পা বাড়াইল ; একবারে দরবর করিয়া নামিয়াও যাইতে পারিল না। তাহাকে যে কাণ পাতিতে হইল, এবং দেখিতেও হইল মোহিনী কি করিতেছে।

মোহিনী দরজার কাছটাতে উবুর হইয়া পড়িয়া কহিতে লাগিল বেশ—যাও। কালো বউকে এনে ঘরের রাণী ক'রো—কিন্তু আমার দেখা আর পাচ্ছো না। আমার শেষ ! জেনো সংসারে আমি ধন দৌলত সম্পদ কিছুই চাইনি। কেবল চেয়েছিনু তোমায়—যতদিন রূপ ছিল,

যৌবন ছিল—তত দিন নিজের সীমানার মধ্যে তোমায় ধরেও রেখে ছিলাম। তারপর বহুদিন পরে যখন যৌবনের জোয়ার নেবে গেল। তখন তুমি যাচ্চো—যাও। সুখ পাবে না। মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী হতে পাঠাচ্চে না সে দুঃখ আমার বুকে যতটা না বাজ্‌চে—তোমার ব্যবহার আমাকে উন্মাদিনী করে তুলেছে। তুমিও রেলে উঠ্‌বে আর আমারও মনে যা আছে তাই করবো!

বারীন জানিত এই রকম চীৎকার করা তাহার স্বভাব। এবং এই রকমই ভয় দেখাইয়া—যতবার সে রেলে উঠিতে গিয়াছে, ততবারই কাঁদিয়া লুটাইয়াছে। বারীন ভাবিল, কাঁদুক সে—আর ফিরচিনে, কোন কথা না বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

মোহিনী দেখিল, যখন বারীন সত্যই এবার তাহার এ কান্নাটাও দলিয়া চলিয়া গেল। তখন আর তাহার কোন আয়োজনই বৃথা।—অনেক কষ্টে যে রূপের ঠাট্‌টাকে সে সুরমা দিয়া, সোনার পাতা দিয়া, মোরক করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল; সেটার দৈন্য যখন ধরা পড়িয়াছে।—তখন তাহার মরণের সঙ্গেই আত্মীয়তাই শ্রেয়।

সে যখন উঠিয়া দাঁড়াইল তাহার মনে হইল, যেন তাহার সব সৌভাগ্য, সব গর্ব্ব, একটা ঘৃণিত সরীসৃপের মত সর্ব্বাঙ্গ

বাহিয়া পায়ের নীচে দিয়া—স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ, ধাপে ধাপে নামিয়া গেল।

বড় জায়ের কাছে বাহির হইতেও প্রবল একটা সঙ্কোচ আসিতেছিল। কিন্তু মনের ভীষণ সংকল্পটাকে একবারেই স্থির নিশ্চয় করিয়া উপর হইতে নীচে নামিয়া গেল। এবং প্রায় প্রত্যেকের কাছেই বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। "সূর্য্য যে গরিমায় উঠে সেই গরিমাতেই অস্ত যায়।"

রমা কথাটা ভাল হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কহিল। ওকি হেঁয়ালী আওরাচ্ছো মোহিনী বউ? যেন আমরা মুখ্যু সুখ্যুই বটে। আর তোমার কর্ত্তাটি অনেক নাটক নভেলই তোমায় পড়িয়েছেন। তবু বুঝিয়ে বল্লেও ত আমরা বুঝতে পারি।

মোহিনী তীব্র দৃষ্টিতে একবার রমার দিকে মুখ ফিরাইয়া, তারপর গজ্ গজ্ করিতে করিতে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

রমা হাসিয়া কহিল আশ্চর্য্য মেয়ে মানুষ! কাছে সুন্দরী ঝি দাঁড়াইয়া ছিল;—পশ্চিম দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া দেখাইয়া অতি আস্তে কহিল, কাশী, মা—বুঝেছ? আর অন্য কারণ নাই। ইঙ্গিতে বুঝাইল, কাহারও ইহাতে কিছু বলিবারও যে উপায় নাই।

"ওমা আমায় খুলে বল্লেই ত হতো—এমন ডাকাত—তা ত জানিনি। এখন বুঝ্ছি ঠাকুর পো এ আট দশ বৎসরেও কেন একবার সময় করে নিতে পারেনি। ও রাঙ্গা বউ আমায় কেন বল্লিনে—একটু তার জন্য দুঃখও হয় নাই?—কি আশ্চর্য্য!

মোহিনী বিদ্যুৎ শিখার মত অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, দীপ্ত স্বরে কহিল, আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য যে কচ্চো—কোন খানটায় আমার আশ্চর্য্য দেখ্‌লে? কোলের ছেলেটাকে ধুপ করিয়া নীচেয় ফেলিয়া রাখিয়া আবার কোমর বাঁধিতে লাগিল। ছেলেটা কাঁদিয়া মরিবার উপক্রম হইল। অথচ রমা একবার লইতে গেলেও এমন করিয়া পায়ে করিয়া আটকাইল, যে রমার এ রণচণ্ডিকা মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া ভয় হইয়া গেল।

মোহিনী থামিল না বলিতে লাগিল। ওরে বাপ্‌রে এ'তো আত্মীয়তা করতে আসা নয়—আমার কপালে আগুন লাগাতেই আসা।—বিয়ে দেখতেও আসা নয়, রঙ্গ দেখ্‌তেই আসা—নইলে দাঁত বের ক'রে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ঝীমাগীদের সঙ্গেও কেউ জট্‌লা করতে পারে? তা লাগাও সর্ব্বনাশীরা যত দূর সাধ্যে কুলায়—চারিদিকে বিষের আগুন জ্বালাও! একবারে যেন লোকটাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

"ঠাকুর পো যাও! ঠাকুরপো যাও!" কি দরদ! এ পোড়াকপালীর কথাটা কেউ ত একবার ভাবে নি। কিন্তু আমিও বলে রাখছি—যতক্ষণ আমার জীবন আছে, ততক্ষণ একঘরে দুজনাকার ঠাঁই কিছুতেই হবে না। কিছুতে না—একজনাকে না একজনাকে মরতেই হবে। যেমন ঝড়ের মত আসিয়াছিল, তেমনি ঝড়ের মত চলিয়া গেল। রমা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া আর বাহির হইতে পারিল না। ঝি মাগিটাও ভয়ে অনেক আগে দৌড় দিয়াছিল!

বিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ রবিবার, আজ তাহাদের কাশী হইতে আসিবার দিন। মোহিনী সকাল বেলায় যখন নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল—তখন তাহার মূর্ত্তি কি অস্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। মুখ চোখ একবারে বিবর্ণ—মাথার কালো চুলের রাশ পিঠ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঘরের বড় আয়না খানায় দিকে দৃষ্ট পড়িতেই মোহিনী ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইল।

কাত্যায়নী কহিলেন, কি হয়েছিল গো—কাল, রাত্রের বেলায় মেজ বৌ। ছোট মেয়েটা যে কাল সারারাত চেঁচিয়েছে।

"শত্রু ওরা! ওকে মরবার রোগে ধরেছে।"—বলিয়া অস্বাভাবিক উত্তেজনায় মেয়েটার পিঠে একটা চাপড় দিয়া, কলতলা হইতে উপরের দিকে উঠিতে লাগিল।

কাত্যায়নী মোহিনীর স্বভাবে ভালরূপই অভ্যস্ত ছিলেন। ভাবিলেন, মেয়েটাকে মারিয়া খুন করিবে। মেয়েটাকে টানিয়া ধরিয়া নিজের কোলে তুলিয়া লইলেন।

মোহিনী একটা বক্র কটাক্ষে কহিল, বড্ড যে আলুনে টস্। এদের নিয়ে ভুগতে হয় তবে বুঝতে পারি।—

"ওরে বাপরে ছেলে জন্মালে কোন মাকেই না ভুগতে হয়? তুমি ত বরং ঝি চাকরের হাতে দিয়ে রেহাই পেয়েছ। সেজে গুজেই দিন কাটিয়েছ। এইবার তোমার সাজও ঘুচবে—তেজও ঘুচবে—বলিয়া কাত্যায়নী ছেলে-টাকে চুপ করাইতে লাগিলেন।—

মোহিনী খানিক কট্ মট্ করিয়া কাত্যায়নীর দিকে তাকাইয়া তারপর একটা রুদ্ধ ক্ষোভের বেদনার ভারেই যেন টলিতে টলিতে উপরের দিকে উঠিয়া গেল।

তোরঙ্গে দামী কাপড় চোপড় ও গহনা যে গুলো

ছিল, সেগুলা বিশ্বস্ত ঝির দ্বারা মেয়ের শ্বশুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল। ঝি গোপন পথ দিয়া খুব সন্তর্পণে সেগুলা লইয়া গেল।

মোহিনী ঝিকে বার বার করিয়া বলিয়া দিল। দেখো খবরদার। এবাড়ীর একটা কাক পর্য্যন্ত জান্‌তে যেন না পারে।

ঝি হাত নাড়িয়া জানাইল সেজন্য তাহার মোটেই চিন্তা নাই।

মোহিনী সারা রাত্রি এই সঙ্কল্প করিয়াছিল—সতীন যে এই গৃহে আসিয়া তাহার সৌভাগ্যের ভাগ লইবে—সে কল্পনাও তাহার পক্ষে অসহ্য! এই সজ্জিত গৃহ, যে গৃহের প্রত্যেকটি সজ্জা সে কত যত্ন করিয়া কত কষ্ট সহিয়া সাজাইয়াছে, এই ফুল তোলা মশারি, এই দামী মেহগ্নীর খাট, ঐ চিত্রপট, এসব কি সেই কালো বউকেই সমানে সমান ভাগ দিতে হইবে বলিয়া আমেরিকা জাপান হইতে আনিয়াইছিল? সংসারে যে কেহই—যত বড় সাধু তপস্বি হউক—আপনার অধিকার আছে জানিলে কে সহজে ছাড়িয়া যাইবে? যখন সে আসিয়া এই সজ্জিত গৃহের পানে তাকাইবে, আর মনে মনে ভাবিবে ইহাতে তাহারও অংশ আছে। তখন? বাপের বাড়ী হইতে সে ও ত কিছু আনিতে

পারে নাই। সবই ত তাহার স্বামীর উপার্জ্জনের সম্পত্তি। ত্দিন পরে চুল চিরিয়া ভাগ লইবার দাবী করিতে ছাড়িবে কি? কেন ছাড়িবে?

মোহিনী আজ শেষবার তাহার আদরের জিনিষগুলির পানে করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া তাকাইয়া লইল।—সে-ও যেমন নিভিবার আগে একবার উজ্জ্বলতম প্রভায় জ্বলিয়া উঠিয়া—তারপর নিভিয়া যাইবে এই সঙ্কল্প করিয়াছে, এই আসবাব গুলিকেও তেমনি একবার উজ্জ্বল করিয়া লইয়া আগুন লাগাইয়া যাইবে—তাহারা আসিয়াছিল তাহার সঙ্গে—যাইবেও তাহার সঙ্গে।—তাই বলিয়া সতীনের সৌভাগ্যের দিনে—তাহারা সমারোহ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিবে না।

সকল ঘর-কন্না ঝাড়া পোঁছা করিয়া, প্রত্যেক আসবাবের তলায় তলায়, কেরোসিন তৈলে ভিজা টুক্‌রা টুক্‌রা ন্যাকরা সাজাইয়া রাখিতে লাগিল। সতীনের গাড়ীর শব্দ যেই বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া থামিবে, ওমনি সে-ও একসঙ্গে ঘরে বাহিরে আগুন ধরাইয়া দিবে।

অতীত দিনের উজ্জ্বল স্মৃতিগুলি, আজ তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া তাহার কাছ হইতে চক্ষের জল আদায় করিয়া লইতে লাগিল।

ফাল্গুন মাসের দিবস। আকাশে কোথাও মেঘের সম্ভাবনা ছিল না। অপরাহ্নের দিকে সবুজ দিগন্তারলের পার্শ্বে, একখানা কালো মেঘ রাহুর মত দারুণ বুভূক্ষা লইয়া আকাশ ছাইয়া উঠিতে লাগিল। অপরাহ্নের স্বর্ণালোকটুকু মেঘের গায়েই তাহার দীপ্তিটুকু ঢালিয়া দিয়া, মেঘের প'রেই অদৃশ্য হইয়া গেল! তারপর বৃষ্টি! একবারে মুষল ধারে বৃষ্টি!—যেন ধরণীর বুকের ভিতর যে অশ্রুটা জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। সেটা মেঘের আকারে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অসীম আকাশের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বৃষ্টি ধারায় ঝরিয়া গেল। মানুষে যে কান্না চাপিয়া রাখিয়া রক্ত ধারায় আপনাকে রঞ্জিত করিয়া লইতে পারে!—জীব জননী ধরণী মাতার ত সে সাধ্য নাই!—তাঁহাকে যে জীব প্রতিপালন করিতে হইবে।

মোহিনীরও এটা মন্দ লাগিল না। ভাবিল—তাহার শেষ বাসরের বিদায় গীতিকে বর্ষা রজনীর কলধ্বনির সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া—অপরূপ এক রোদন সঙ্গীতে মুখর করিয়া দিবে। সে যখন মরিবে···তাহার মৃত্যুর পরও ঝম্ ঝম্ বীণার তারে···অদৃশ্য মমতাময়ী তাহার এই ব্যথিতা কন্যার জন্য চোখের জলের গান গাহিয়া, লোক লোকান্তরে সে কথা রাষ্ট্র করিয়া দিবে। এমন কি ঈশ্বরের দরবার পর্য্যন্ত!—

বৈকাল হইতেই সাজ সজ্জা করিয়া ফেলিয়াছিল। ঝিকে বলিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহার শরীর অসুখ, গতরাত্রে ছেলেরা সারারাত্রি তাহাকে জ্বালাইয়াছে। আজ সে একলাই থাকিবে।

যে বিলাতী খোঁপা বাঁধিলে—যে গহনা পরিলে—যে রং লাগাইলে—এককালে সে মানুষের চোখে পরী বলিয়া ধাঁধা লাগাইতে পারিত। আজ সে অনেক দিনের পরে সেই রকমই আয়োজন করিতে লাগিয়া গেল। কবে কোন্ প্রথম যৌবনে তার সৌভাগ্যের দিনে, স্বামী তাহার ইটালীয় ধরণে একটা গাউন তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিল। (এবং যাহাতে সে স্বামীর কাছ হইতে পরী রাণী আখ্যা পাইত।) সেটাকে শুদ্ধ পরিতে বাদ দিল না। দুই ভ্রুর মধ্যে হীরকটাকেও ঝুলাইয়া দিল। যতবার সাজ পরিয়াছে ততবারই আয়না দিয়া মুখ দেখিয়াছে। এতদিন পরে... তবু তাহার রূপের এতটুকু কম্‌তি হয় নাই। দেহের প্রতি আর ততটা যত্ন ছিল না—তাই যাহা হউক—নহিলে কটাক্ষে ভুবন জয় করিবার সে শক্তি—বোধ হয় এখনও লুপ্ত হয় নাই।—

লম্বা বারান্দাটায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার মনে হইল যেন মেঘেরাও বলাবলি করিতেছে ওগো

সুন্দরী! ওগো অপরূপ! এরূপ যে পৃথিবীর নয়! এ যে ইন্দ্রলোকের ঐশ্বর্য্য।

হায় গো এত রূপ! তবু তাহার স্বামীর চক্ষে ধরিল না? শেষে—কালো রাণীরই জয় হইল। ললাট লিখন! মাথায় হাত দিয়া কৌচটায় বসিয়া পড়িল।

নারী জানিত না। রূপের জন্যই মানুষ মানুষের চরণে দাসখত লেখে না। যাহা প্রকৃত রূপ সে ধূপেরই মত একটা সুগন্ধের ধূমে আপনাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া বুকের ভিতর জমাট হইয়া বসে।

পাশের ঘরের জানলার দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার বড় জা তাহার দিকে জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। সে-ও বোধ হয় এইরূপ—এই সজ্জাই দেখিতেছিল। দেখুক! দেখুক! তাহার চক্ষু সার্থক হউক!

সেদিন জায়ের সহিত তাহার গণ্ডগোল হইয়াছিল নহিলে মোহিনীর ইচ্ছা হইয়াছিল, 'জা'কে একবার ডাকিয়া তাহার মুখ দিয়া নিজের অসামান্য রূপের বর্ণনাটা শুনিয়া লইত। কিন্তু থাক্—আর প্রয়োজন নাই।

এমন সময় সই দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিল, সই···

প্রথম আহ্বানটা মোহিনীর কর্ণে গেল না।

সই, দ্বারে মৃদু আঘাত দিতে দিতে বলিতে লাগিল, আজ তোমার সয়া বাড়ীতে নাই সই...তাই এই বাদ্‌লার দিনটাতে ভাবলুম, সইএর কাছেই খানিক জটলা করে বিরহটাকে জুরিয়ে নিয়ে আসি। শুনলুম নাকি তোমার কর্ত্তাটিও আজ ঘরে নাই। সই· ·ও-সই (কবাট খুলিয়া গেল) একি সই আজ যে বড় সজ্জা !...

মোহিনী কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া কেমন যেন উন্মনা ভাবে কহিল, হাঁ সই।...নেভ্‌বার আগে দীপ একবার উজ্জ্বলতম প্রভায় জ্বলে উঠেছে।

সই কহিল, সে কি রকম সই ?

"রূপের পরীক্ষা দিতে হবে।...আর অন্য কারণ নাই। বুঝেছ ? এখন বলো ত বলো-ত সই !...কেমন মানিয়েছে। আজ একবার শেষবার তাদিকে ডেকে এনেছি।—যারা এতদিন আমায় ভোলাবার সম্মোহন মন্ত্রটি দিয়েছিল। এই হীরকহার—এই সজ্জা—হাত দিয়া দিয়া দেখাইতে লাগিল।

সই কহিল সে কি সই ?...ভোলাবে আবার কাকে ? এত দিনের পরেও ভোলাবার নতুন আয়োজন করতে হয় না—কি ?

মোহিনী, শূন্যে দুই বাহু তুলিয়া যেন ভবিষ্যতের একটা বিরাট শূন্যতার পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল। যেমন

দিনকাল পরেছে।—তোমাদের পেছনে ত একটা ক'রে সতীন নাই।...কেমন করে বুঝবে বলো ভাই...?

সই তাহার সইএর বেদনায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল। এতদিনের পর...তিনি, আবার তোমার সতীন আন্‌তে বেরিয়েছেন না কি ? দুঃ...তাও কখন হয় ? মিথ্যে কথা !...

"খানিক রাত্রির পর এসো—দেখবে কতটা সত্যি—পূর্ণিমা তার রূপের রাজ্যের বাতিগুলো—সব এক সঙ্গে জ্বেলে দিয়ে দেউলে হয়ে যাচ্চে...আর অন্ধকার নীচে হ'তে পাতাল ফুঁড়ে...নাগ কন্যার মত তার জীবন জোয়া—হাহাকার নিয়ে ছুটে আসচে—তোমরা দেখো তখন। কি লজ্জা ! কি লজ্জা !

মোহিনী একবারে দুই হাত দিয়াই মুখটা ঢাকিয়া ফেলিল।

সইও ভাল বুঝিতে পারিল না। সে শুনিয়াছিল মোহিনীর যে সতীন আছেন তিনি একটি অন্ধকার ! এমন কি "যাহা" স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন তাও কালী হইয়া যায়। অবশ্য এ রকম বিশেষণ দিয়া অন্ধকারের বর্ণনা কাহিনী, শ্রবণ—সে-ও তাহার সইএর কাছ হইতেই শুনিয়াছিল। তথাপি তাহার অবিশ্বাস হইতে লাগিল। অথচ সইএর কথা

বার্ত্তা, ভাব ভঙ্গী, যে প্রকার—তাহাতে মিথ্যা বলিবারও যো নাই। মোহিনীর হাতটা ধরিয়া কহিল। আমি নিশ্চয় ব'লছি মিথ্যে—ছেলে পিলের মা, আচ্ছা আমার গা ছুঁয়ে বলো দেখি, সত্যি—

মোহিনী দুই হাত, তাহার সইএর স্কন্ধের পরে রাখিয়া বিগলিত বেদনার দাহে কহিতে লাগিল। তাই বলো সই মিথ্যাই হোক। কিন্তু যদি সত্য হয়!...যদি সত্য হয়—এই যে আমার এতদিনকার সাজানো ঘর কান্না!...আমার সুখের দুঃখের আনন্দ উৎসবের স্মৃতি, যেখানকার প্রত্যেকটি ইট পাথরেও পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে আছে।...সে সব সমান অংশে আর একজনাকে ভাগ দিয়ে...ভিখারীর মত দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা...সে কি আমার সাধ্য? তাই ঠিক করেছি যদি নিতান্তই সত্য হয়...তবে সমারোহের সঙ্গে মৃত্যুকেই বরণ করবো তবু।——

সই বাধা দিয়া মোহিনীর মুখটাতে দুই হাত চাপা দিয়া কহিল। পাগল্...নিশ্চয় তোমাকে...তাঁর কোন কারণ হেতু রাগাবার বাসনা—তুমি ছেলে পিলের মা—তাতে সেদিন জামাই হয়েছে, দেখো, কোথায় গেছেন—আবার আজই ফিরে আসছেন। আমিও ত আজ নতুন নহি, আমি তাঁকেও চিনি।

দুর্দ্দিনের তিমির রাতের মাঝে, দূরে হঠাৎ চকিতের মত আশার আলোকেও যেমন মানুষকে চকিত করিয়া তুলে, তেমনি সইএর এই স্নিগ্ধ সরসবাক্যগুলি একটা সান্ত্বনার মতই মোহিনীকে স্পর্শ করিল। মোহিনী তাহার সইএর হাতটা চাপিয়া কহিল—

সত্যই সই তুমি আমায় ভালবাসো—মায়ের পেটের বোনের মত। তাঁকেও যেমন চিনে আসছো—আমাকেও ত তেমনি চিনে আসছো--দেখেছ ত এই মিথ্যে ঠাট্ বাট বজায় করতে আমায় কত-না চেষ্টা পেতে হয়েছে। রূপটা···সূর্ম্মা, এই মেয়ের মা হয়ে পর্য্যন্ত···শুধু ভেবেছি ··কি জানি যদি গুণনিধি ফাঁকি দিয়ে যান। কিন্তু সেদিন যেন দেখ্লুম আমার কটাক্ষটা ব্যর্থ হয়ে গেল···তাই আজ আর একবার শেষ আয়োজন করে বেরিয়ে পড়লুম। ভাবলুম—যদি তাই সত্য হয়···তবে এক আসনে দুজনাকার ঠাঁই হবে না। কিছুতে না। তাই—

আর বলিতে পারিল না। শেষ সজ্জায় সজ্জিত হইয়াও যেন তাহার জীবনটার পরে মমতা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এই ফলে জলে পূর্ণ এমন শ্যামা বসুন্ধরা!···

সই কহিল খুলে ফেলে সই এ সব! রাত অনেকটা হ'য়ে এলো প্রায়!...আজ চল্লুম। কিন্তু আমি তোমায়

সত্যই ব'লছি খ্যাপামীতে আপনাকে ভরিয়ে রেখো না। তুমি যদি সারা জীবন স্বামীকেই ধ্যান করে এসে থাকো। তবে স্বামীকে, ফিরে দাঁড়াতেই হবে—যতই বিমুখতা দেখান।

সই বাহির হইয়া গেল।

মোহিনী কহিল, আলো দেখাইব?

সই কহিল, প্রয়োজন নাই।

বাহিরে তখনও অন্ধকার আকাশে মেঘ কাটে নাই। তিমির রাত্রি, যেন পারার্থী যাত্রী "না"য়ের মত অনন্ত সমুদ্রের কিনারায় খেয়া সাজাইয়া অপেক্ষা করিতে-ছিল। সম্মুখের ভয়ের ভাবনার ঘোমটা অপসারিত হইলেই হয়।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, রাত্রি প্রায় আটটা বাজিয়া গিয়াছে। মোহিনী আবার অস্থির হইয়া উঠিল। শুনিতে পাইল। বড় জা রমা যেন চাকরকে বলিতেছে গাড়ী লইয়া যাও। তাহাদের আসিবার সময় হইয়াছে।

আর মোটেই মিথ্যা নয়। তাহারা সব চলিল।—এই মোহিনীর অদৃষ্টে আগুন জ্বালাইবার নিমিত্ত—তাহাদের কি আয়োজনের ধূমই পড়িয়া গিয়াছে। আজ সবাই তাহার বিপক্ষে—বাড়ীর চাকরটা পর্য্যন্ত—যে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও

তাহাদের বাড়ীর এই মাঠাকুরাণীর একটা আদেশ পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া রহিত। যাহার আদেশ ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মান্য করিত। পলকেই সে সমস্তেরই কি গাত বিপর্য্যয়!...মানুষের কাছে অতীতটা একবারে কিছুই নয়। অপূর্ব্ব প্রেহেলিকাময় এই জগত। যতক্ষণ হাত, মুখের উপর পর্য্যন্ত খাদ্য তুলিয়া দিতে পারিতেছে-ততক্ষণই হাত আপনার—তারপর আর কিছুই নয়। মোহিনী উন্মাদ প্রায় হইয়া উঠিল। একবার ডাকিল ধন্নিলাল।

মেঘ বৃষ্টি মাথায় করিয়া ধন্নিলাল দ্রুত তাহার মনিবের কাজে চলিয়া যাইতেছে। আহ্বানটা পর্য্যন্ত কাণে গেল না? "অকৃতজ্ঞ জানোয়ার" কিন্তু সে ত কিছুই নয়। প্রস্তুত হও মোহিনী। আর মোটেই বিলম্ব নাই। ইচ্ছা হয় একবার সংসারের সহিত শেষ দেখা দেখিয়া লও।

প্রায় ডজন খানেক হাপ বাতি ঘরে জ্বালাইয়া দিল। এই বাতি যখন পুড়িয়া শেষ হইয়া যাইবে তখন আপনিই সব জ্বলিয়া উঠিবে—এই গৃহের কোথাও বাদ যাইবে না। তৈলাক্ত বস্ত্র খণ্ড গুলি তাহার স্মৃতির কঙ্কাল স্তূপের উপরে ইন্ধন রাশির মত সজ্জিত হইয়াছিল।

দেরাজ হইতে একটা ঔষধের শিশি বাহির করিয়া ফেলিল। গৃহস্থালীর জন্য এসব সঞ্চয় মোহিনীই একদিন

করিয়াছিল। সুখের দিনে যাহা রোগের প্রতিষেধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, দুঃখের দিনে তাহা মৃত্যু সহচর হইয়া দাঁড়াইল। অদৃষ্ট আর কাহাকে বলে? মোহিনী বিষের শিশিটির শিপি খুলিয়া ফেলিয়া খানিক ভাবিল। একবার কন্যাদের ও জামাতার মুখখানি স্মরণ হইল। আবার রাখিয়া দিল, ভাবিল। যেই সত্যই গাড়ী দ্বারে আসিয়া পৌছিবে ওমনি মুখে ঢালিয়া দিবে। ইংরেজদের মত ডুয়েল লড়িবার ত উপায় নাই—নহিলে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ছিল। গৃহের চারিদিকের বাতিগুলির জীবন প্রদীপ গলিয়া গলিয়া ক্ষয় হইয়া যাইতেছিল।—ঘড়িতেও নয়টা বাজে ঘরির কাঁটাও যেন দ্রুততালে প্রহর বাজাইয়া চলিয়াছে—তাহারও দুদণ্ড অধিকক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে দিবার সে ফুর্সৎ নাই। মোহিনী আবার শিশিটা নাড়িয়া রাখিয়া দিল।

এমন সময় বাহির দরজায় একখানা গাড়ীর শব্দ আসিয়া থামিয়া গেল। একবারে কি স্পষ্ট ঘর্ঘর আওয়াজ! মোহিনীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত—সমস্ত শিরা উপশিরা গুলা কণ্টকিত হইয়া উঠিল। আর বিলম্ব করিতে পারিল না। ঐ যে বড় জা আলো লইয়া তাহাদের আহ্বান করিয়া আনিতে বাহির হইল। দুয়ার খোলার শব্দটা

কি ভীষণ! মোহিনী চোখ বুজিয়া ঔষধের শিশি গলায় ঢালিয়া দিল! একবারে সবটা—কালোবউ এইবার আইস। রাজত্ব করিতে।...কিন্তু তথাপি মনে থাকে যেন সতীনের প্রতিহিংসা লইতে হইবে। একবার উপর হইতে ঝুঁকিয়া জানলার ফাঁক দিয়া দেখিয়া লইতে চাহিল। কিন্তু অন্ধকারে ভাল কিছু নজর হইল না। শুধু ছায়া।...কালোবউএর ছায়া ত মহাকালোতে মিশাইয়া গিয়াছে, বাকী অন্য ছায়া-গুলা প্রেতের মত প্রাঙ্গণে সারি দিয়া দাড়াইয়াছে। মোহিনী সশব্দে জান্‌লা বন্ধ করিয়া দিল।—ঘরের মধ্যে বেড়াইতে লাগিল যেন পুচ্ছ বিমর্দ্দিতা ভুজঙ্গিনী...পায়ের শব্দে, শেল্‌ফ আলমারী গুলা শুদ্ধ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। হঠাৎ গোটা কয়েক কাচের পুতুল পরস্পর ঠোকাঠুকি হইয়া নীচের পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। অনেকক্ষণই যে অতিবাহিত হইয়া যায়। মোহিনীর চক্ষু জড়াইয়া আসিতে লাগিল।

* * *

রমা গাড়ীর শব্দ পাইবামাত্র তাড়াতাড়ি বাহিরে বাহির হইয়া কহিল ঠাকুরপো এলে সব তোমরা? গাড়ী হইতে বারীনই আগে নামিয়া পড়িয়াছিল—

বারীন কহিল হাঁ।

রমা কহিল, মেজোবউ কই?

বারীন গম্ভীর স্বরে কহিল, বাবাকে জিজ্ঞাসা করো।

রমা মাথায় ঘোমটা—একটু টানিয়া দিয়া কহিল বাবাও এসেছেন নাকি?

হরনাথ আপনার বিপুলায়তন দেহখানি অতিকষ্টে গাড়ী হইতে বাহির করিয়া ধরাকণ্ঠে কহিলেন, মা···হারিয়ে এসেছি, সে অনাদৃতা অভিমানিনী—বিশ্বেশ্বরের চরণে তার ব্যথা নিয়ে গিয়েছিল, বিশ্বেশ্বর তাকে টেনে নিয়েছেন।

রমা স্তম্ভিত হইয়া গেল। এতটার সে কল্পনাও করে নাই। শোকোদ্বেলিত কণ্ঠে কহিল, কিসে কি হলো ঠাকুরপো—বল—বল শুনি, যাবার সময়ও সে বলে গিয়েছিল—আশীর্ব্বাদ করো দিদি আর যেন ফিরে না আসতে হয়। সত্যই তাই হলো? রমার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বারীন কহিল, সে কি বলবো বৌ সে যেন আমারি জন্য অপেক্ষা করছিল—ঠিক একবারে আমারি জন্য··· একটা কথাও হলো না। হাতে হাত রেখে ওম্নি চলে গেল। চোখের জলটাও আমার দেখলো না—কাল্ ওলাউঠোয় ধরেছিল কি না। তার উপর সে শরীরের উপর মোটেই যত্ন করতো না। শীতের দিন হয়ত সারারাত্রি ভিজে

কাপড়ে কাটিয়েছে। বাবার মুখে সব শুনবে এখন··· চলো—নেয়ে ধুয়ে ঘরে ওঠা যাক্। শুক্ল পক্ষকে সুসংবাদ দাও গে—

রমা অনিন্দ্যার নাম ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উপরে উঠিতে লাগিল। বলিতে লাগিল মোহিনী বউ আর তোমার দ্বেষ, হিংসে, গোসার, দরকার নাই ভাই—তোমার যা কণ্টক—আপনিই সরে গেছে!—এখন তোমার নিষ্কণ্টকে রাজত্ব! রাজত্ব করো—

ঠেসান কবাটটা ঠেলিতেই দেখিল একি ব্যাপার? ঘর ময় আলো হইয়া গিয়াছে বতিগুলা ধূ ধূ করিয়া পুড়িতেছে। গৃহের সমস্ত আসবাব রাশিও পুড়িতেছে। আর সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নির দিকে মোহিনী উন্মাদিনীর মত চাহিয়া আছে।—

রমা ডাকিল, মেজ বউ?

মোহিনী মত্তস্বরে কহিল, চুপ করো···দাঁড়াও! আর ক্ষণেক অপেক্ষা করতে বলো···তারপর আমি ঘর ছেড়ে দিয়েই যাচ্ছি!—আর একটু বাকী—এরা আমার সৌভাগ্যের সহচর ছিল, আমার সঙ্গেই সবাই চলে যাবে।—

রমার চোখের জলটা ভয়ে থামিয়া গেল। সতীন আসিবে বলিয়া মেয়ে মানুষের এতটা বিষ জন্মিতে পারে

রমা এই প্রথম দেখিল। সতীনকে ভাগ দিতে হইবে বলিয়া কাপড় চোপর গুলাতে পর্য্যন্ত আগুণ ধরাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহার দাঁড়াইয়া দেখিবার ও আর সে সময় নাই। ঘরের কড়ি কাঠেই বা আগুন লাগে।

রমা চীৎকার করিয়া ডাকিল, ঠাকুপো এসো এধারে—এদিকে তোমার মোহিনী বউএর কাণ্ড দেখে যাও। একবারে আগুন জ্বেলে দিয়েছে—ঘর কন্না ময় আগুন! আগুন!

আগুনের নাম শুনিয়া সকলেই ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বারীনও উপস্থিত হইল। কাত্যায়নী হরনাথ, তাঁহারাও পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মোহিনী উন্মাদিনীর মত চীৎকার করিয়া কহিল, এসেছো। সব—দাঁড়াও। আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব···তারপর আমি ছেড়েই দিচ্চি সব। বারীনের পায়ের কাছটাতে এক গাছা হাতের কাছের বকুলমালা ছুড়িয়া দিয়া কহিল। এই নাও গো দেবতা! যে মালায় এতদিন আমায় জরিয়ে রেখেছিলে—সে মালা—আবার তুমিই নাও। যে মনের মত তাকেই দিও। বলিয়া যেন অসহ্য বেদনা ভরে মেঝের উপরটাতেই হাত রাখিয়া বসিয়া পড়িল!

কাত্যায়নী চীৎকার করিয়া, গোলমাল করিয়া কহিলেন

ও রাক্ষসী যেন পাগলই হয়েছে···আগুন নেভাবার ব্যবস্থা করো। দমকল ডাকাওগে—ঘর খানা কি তোমাদের চোখের সামনে পুড়ে যাবে—তাই দেখবে? ওরে ও ধনি লাল। ও বারীন। নিজেই একটা কলসী করিয়া জল আনিয়া ছিটাইতে লাগিলেন।

হরনাথ কহিলেন, আশ্চর্য্য সতীনের রিষ। তিনি ফায়ার বিগ্রেডে টেলি ফোঁ করিতে নামিয়া গেলেন।

বারীন কহিল, এযে কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে, এতটা রিষ আগে তা ত জানুম না—বেশ, সংকল্পই যদি ছিল, তবে আগে সতীনটাকে দেখেই তবে আগুন দেওয়া ত উচিত ছিল। কোথায় সে—

মোহিনী জোর হাত করিয়া সেই উন্মাদ কণ্ঠে কহিল, আর ভুলিও না গো—অনেক ভুলিয়েছ।···অনেক সোহাগ করেছ। এতটা ফাঁকি, জানতাম না—নিয়ে এলে কালো রাণীকে—আট ঘোড়ার রথে চড়িয়ে···মনে করেছ শুনতে পাই নি? গাড়ীর চাকার শব্দ যে মেঘের ডাক্‌কেও ছাপিয়ে আস্‌ছিল। শুনেছি গো—শুনেছি—আমার বুকে সে আওয়াজ বেজেছে—

বারীন কহিল, বুঝিয়ে বলো বড় বউ। বলো যে সে কালো বউ, ওলাউঠোয় কাশীতেই চলে গেছে! আর

তোমার সুখের পথে কাঁটা হ'তে আসবে না, বুঝিয়ে বলো।

মোহিনী জড়িত কণ্ঠে কহিতে লাগিল, বোঝাবে আর কাকে? আমারই বা কতক্ষণ? আর মিথ্যে মায়ায় ভুলবো না। অনেক ছলনাই করেছ।...দশবৎসর ছলনা করেছ।...আমার সৌভাগ্যের সঙ্গে...আমার জীবনেরও শেষ ..তাই এ সজ্জা! মনে ধরে কি গো—মনে ধরে...?

একটা আশঙ্কায় রমা তাড়াতাড়ি মোহিনীকে চাপিয়া ধরিয়া দেখিল, একটা তীব্র গন্ধ, তাহার মুখ হইতে নির্গত হইতেছে। ব্যস্ত হইয়া ডাকিল। ঠাকুরপো দেখ দেখি বোধ হচ্চে আগুন লাগিয়েও এর আশা মেটে নি, বিষও খেয়েছে—এই যে লাল ভাঙচে।

মোহিনী রমার কোলটাতে ঢলিয়া পড়িয়া কহিল, হাঁ দিদি বিষই খেয়েছি...এক সঙ্গে জীবন, যৌবন, ঐশ্বর্য্য সবারই মূলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছি...এখন দেখুক দাঁড়ায়ে ঐ সর্ব্বনেশে...শুধু কি তাই? মরণের পরও প্রেত হয়ে প্রতিহিংসা নেব।

রমা কাঁদিয়া কহিল, হায় অভাগিনী কার সর্ব্বনাশ করতে কার সর্ব্বনাশ করলি? তুই যে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডেকে আনলি—এমন স্বামী কন্যা ফেলে কি না বিষ

খেলি ? ··তোর সতীনও কি এলো ? তোর স্বামী যাবার আগেই বিশ্বেশ্বরের বুকে তার ভার নামিয়ে রেখেছিল। এখন তুইও গেলি !—ডাক্তার ডাকাও ঠাকুরপো—ডাক্তার ডাকাও। বাঁচলেও বাঁচতে পারে—

বারীন এতক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল পৃথিবী যেন তাহার পদ নিম্নে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। আস্তে আস্তে সরিয়া আসিয়া কহিল। ডাক্তার ডেকে আর কি হবে বড় বউ ? জীবনে সুখ হবে না জানি, ঐ যে মা-টিকে দেখছো—উনিই আমার সমস্ত জীবনটাকে জ্বালিয়ে দিলেন। কি যে মেয়ের বাপের টাকার পরে তাঁর লোভ ছিল—একটা জীবন নষ্ট করে দিলে। সে দীর্ঘশ্বাস কি বিফল হয় ? সাতবৎসর আগে-কার বেহারী বাবুর অভিশাপ মনে পড়ছে···মা—মনে পড়ছে কি !

কাত্যায়নী মোহিনীর শীর্ণ প্রায় মুখের উপর পড়িয়া কহিলেন ওরে বারীন, তাতে কি আমি একলাই দোষী ? তুই কিছু জানতিসনে ?···ওঠো মা আমার ওঠো ! তুমি যে রাঙ্গা বউমা—মা মোহিনী ! রাজরাজেশ্বরী ! ওরে ও ধন্নিলাল, যা বাবা শীগ্‌গীর ডাক্তার নিয়ে আয়—এখনও মুখ চোখ নীল হয়ে যায়নি।—

ধনিলাল আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহার মুনিব-ঠাকরুণের আদেশ পালন করিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সমাপ্ত।



এই গ্রন্থকারের লেখা বই

মুখার্জ্জি বোস এণ্ড কোং ও অন্যান্য দোকানে পাওয়া যায়—

১। **ভালবাসা**।—প্রিয়জনের হাতে উপহার দিবার সুন্দর সামগ্রী। ভারতী বলেন, লেখকের বিশ্লেষণাত্মক উপন্যাস লিখিবার শক্তি আছে, ভাষায় ভাব আছে—প্রাণ আছে, আজকালকার আত অল্প লেখকের উপন্যাসেই এরূপ রচনাশক্তির পরিচয় পাই। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। **মায়ার শৃঙ্খল**।—বাঙলার কন্যাদায়গ্রস্থ জীবনের করুণ কাহিনী। প্রবাসী বলেন, প্রাঞ্জল মার্জ্জিত ভাষায় রচিত। এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা যথেষ্ট আনন্দ পাইয়াছি, লেখক হৃদয় দিয়া বইখানি লিখিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার বক্তব্যগুলি সহজেই পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করে। মনস্তত্ব বিশ্লেষণে গ্রন্থকারের শক্তির পরিচয় পুস্তকের অনেক স্থলেই পরিস্ফুট। মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

৩। **শুভ-দৃষ্টি**।—মনোজ্ঞ গল্পসমষ্টি। সুন্দর বাঁধাই দাম ॥০ আট আনা মাত্র।

৪। **স্বর্ণ-মরু**।—যুবকদের পড়িবার একান্ত উপযোগী। ইহাতে ভাবিবার ও বুঝিবার অনেক আছে। দাম ॥০ আট আনা মাত্র।

৫। **স্বয়ম্বরা**।—স্বর্গ হইতে যেন একটা সুর নামিয়া আসিয়া, পৃথিবীর উপর দিয়া একটা অসহ্য পুলক আঁকিয়া গিয়াছে। দাম ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।